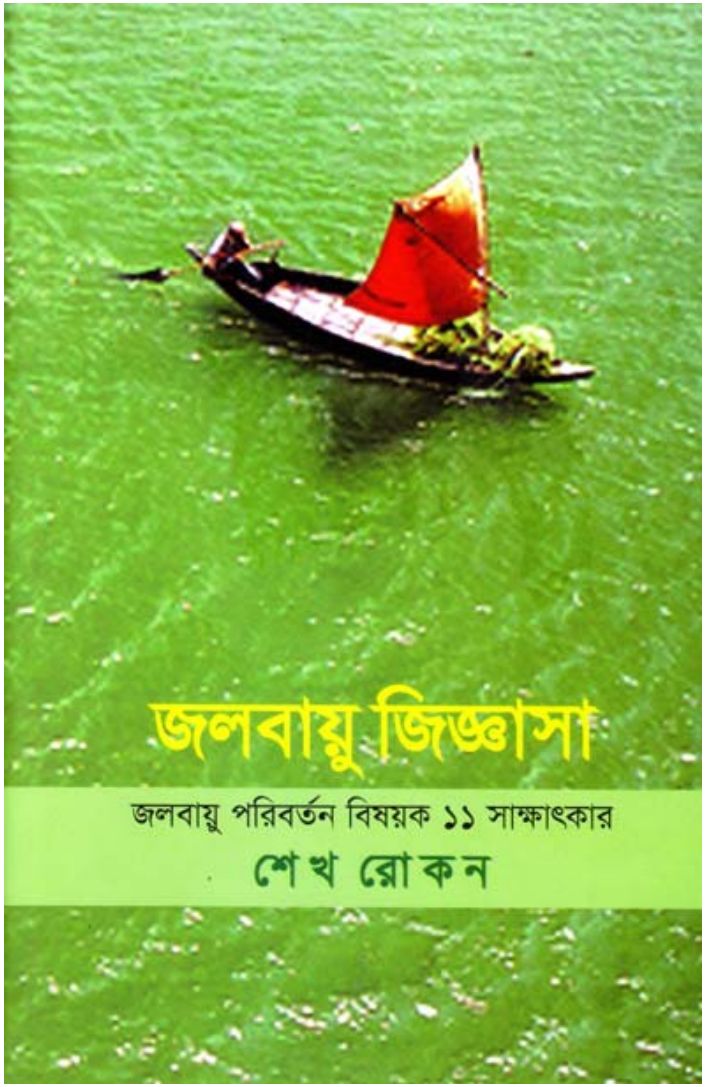

জলবায়ু জিজ্ঞাসা

জলবায়ু জিজ্ঞাসা

শেখ রোকন

জলবায়ু জিজ্ঞাসা
শেখ রোকন

প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রকাশক মামুন অর রশিদ আদর্শ ৩৮ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০ মোবাইল ০১১৯১-২৩২৭৭২
স্বত্ব শেখ রোকন
প্রচ্ছদ ডেভিড এক্স এর আলোকচিত্র অবলম্বনে রাজিব রায়
মুদ্রণ চিত্রকল্প ১৭৯/৩ ফকিরের পুল, ঢাকা ১০০০
মূল্য ২০০ টাকা

Jolobayu Jiggasha
(A Collection of Interviews on Climate Change)
Interviewed by Sheikh Rokon
Published by Mamun Or Rashid of Adarsha
38 Banglabazar Dhaka 1100 Bangladesh
adarshabd@gmail.com
www. adarshabd.wordpress.com
First Edition February 2011
Price Tk. 200 :: US $ 10

ISBN 978-984-8875-19-3

উৎসর্গ

‘যদি পড়ে আশ্বিন, গাও করে শিন শিন’
আমার মা বেগম রোকেয়া আহমেদের মুখে এই প্রবচন
বহুবার শোনার বহু বছর পর বুঝেছি বাংলার নারীরা
কীভাবে নিজেদের জীবন ও অভিজ্ঞতা দিয়ে
প্রকৃতির পরিবর্তন টের পান।

mwP

গোলাম সারওয়ার
ভূমিকা ॥ ৯ ॥

শেখ রোকন
কৈফিয়ত ও কৃতজ্ঞতা ॥ ১১ ॥

এ আতিক রহমান
জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ও দারিদ্র্য একই সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে ॥ ১৩ ॥

আইনুন নিশাত
উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণে প্রকৃতির চাহিদা বিবেচনা করা হয়নি ॥ ২২ ॥

সলীমুল হক
জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত নিয়োগ করা দরকার ॥ ২৭ ॥

শাইখ সিরাজ
কৃষককে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে ॥ ৩৫ ॥

হাছান মাহমুদ
জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় বাংলাদেশ সোচ্চার থাকবে ॥ ৪৩ ॥

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
সহায়তার জন্য বসে না থেকে নিজের সামর্থ্যের দিকে তাকাতে হবে ॥ ৪৯ ॥

রাজেন্দ্র কুমার পাচুরি
বিজ্ঞান ও নীতির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের কাজ করে চলছে আইপিসিসি ॥ ৫৬ ॥

আইনুন নিশাত
আমাদের বিপুল জনসংখ্যা বিরাট ঝুঁকির মুখে থাকার বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ॥ ৬৫ ॥

আহসান উদ্দিন আহমেদ
জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণায় বাংলাদেশ নজির সৃষ্টি করছে ॥ ৭৭ ॥

জিয়াউল হক মুক্তা
জলবায়ু ইস্যুতে এখন সরকার ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার বক্তব্যে ফারাক নেই ॥ ৮৪ ॥

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান
জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্তদের সুরক্ষা ব্যবস্থা দাতব্য নয়, অধিকারভিত্তিক হতে হবে ॥ ৯১ ॥

ভূমিকা

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বিষয়টি নিয়ে নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকে আমরা কম-বেশি অবগত ছিলাম। পরিবেশ বিশেষজ্ঞ না হয়েও আমরা মোটা দাগে জানতাম যে, বন সংহারসহ পরিবেশ-প্রতিবেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণে ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়ে উঠছে পৃথিবী। এই উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া কতটা ব্যাপক ও ভয়াবহ, সে সম্পর্কে ২০০৭ সালের আগ পর্যন্ত বিশ্বের অনেক বিজ্ঞানীরও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ওই বছর আইপিসিসির (ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশের পর জানা গেল, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ু পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। সর্বনাশা সেই পরিবর্তন মানব জাতির জন্য এককভাবে বৃহত্তম বিপদ হয়ে দেখা দিতে যাচ্ছে। এর বিরূপ প্রভাবে খাদ্য নিরাপত্তা, জীববৈচিত্র্য, সভ্যতা– বলতে গেলে সবকিছুই হুমকির মুখে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশের জন্য বাড়তি বিপদ হচ্ছে দক্ষিণের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে উপকূলীয় বিস্তীর্ণ অংশ প্লাবিত ও লবণাক্ত হয়ে পড়া এবং উত্তরে হিমালয় পর্বতমালার হিমবাহ মাত্রাতিরিক্ত হারে গলে গিয়ে বন্যা ও নদীভাঙন বৃদ্ধি।

আশার কথা, গোড়ার দিকে গড়িমসি করলেও আইপিসিসির চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশের পর বিশ্ববাসী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার ডাকে সাড়া দিতে বেশি বিলম্ব করেনি। এতদসংক্রান্ত বৈশ্বিক চুক্তি কিয়োটো প্রটোকল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মতো যে দু'একটি দেশ দোটানায় ছিল, ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশের পর তারাও বাকি বিশ্বের সঙ্গে এক ধরনের ঐকমত্যে পৌঁছে। যে কারণে ওই বছর ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার পদ্ধতিগত বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনো দ্বিধা ছিল না। পরবর্তী কিছুদিনের মধ্যে অবশ্য জলবায়ু পরিবর্তন ও এর বিপদের বিষয়টি কেবল নীতিনির্ধারক ও বিশেষজ্ঞ মহলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বোঝাপড়ার বিষয় হয়ে যায় এ প্রসঙ্গ। এর পেছনে সংবাদমাধ্যমের অবদান অনস্বীকার্য।

আমার নিজের সুযোগ হয়েছিল বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে ২০০৯ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত পঞ্চদশ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার। সেখানে গোটা বিশ্বের রাষ্ট্রনেতা, মন্ত্রী-আমলা, বিশেষজ্ঞ কিংবা পরিবেশকর্মীদের নিরলস তৎপরতা আমার কাছে রীতিমতো আশাজাগানিয়া ছিল। ডিসেম্বরের বরফশীতল কোপেনহেগেন থেকেও আমার মনে বারবার উষ্ণ আশা জেগেছিল, ধরিত্রীকে বাঁচাতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের এই কর্মোদ্যম বৃথা যেতে পারে না। আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি সংবাদকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম। দিন-রাত একাকার করে তারা ওই সম্মেলন সংক্রান্ত খবর ও বিশ্লেষণ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত

নীতিনির্ধারকদের বিভাজনে কোপেনহেগেন সম্মেলন আমাদের আকাঙ্ক্ষা খুব একটা পূর্ণ করতে পারেনি; কিন্তু সেখানে দায়িত্বরত সাংবাদিকদের পরিশ্রম বৃথা যায়নি। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা আজ গোটা বিশ্ববাসীর অভিন্ন ইস্যু। বাংলাদেশও এখন বিশ্ব সংবাদমাধ্যমের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে নানা বিবেচনায় সবচেয়ে বিপন্ন দেশ হিসেবেই কেবল নয়, এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক বিভিন্ন অর্জনও আমাদের স্বতন্ত্র করেছে। বিশ্বে সবার আগে ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন বা নাপা এবং পরবর্তী সময়ে ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ। নীতিগত প্রস্তুতির পাশাপাশি ১৪শ' কোটি টাকার নিজস্ব তহবিল গঠনও তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের পক্ষে কম শ্লাঘার নয়। জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বাংলাদেশে আমরা বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞও পেয়েছি। বিশেষ করে অভিযোজন কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা অন্যদের সমীহ অর্জন করেছেন। উন্নত বিশ্বের নীতিনির্ধারক, গবেষকরাও এ ব্যাপারে শিখতে আসছেন আমাদের কাছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে আমাদের সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা আলাদা করে মূল্যায়নের দাবি রাখে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে কিংবা এ সংক্রান্ত বিশ্বচিত্র নাগরিকদের জানাতে আমাদের মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সাধারণ পাঠক ও দর্শকের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আমাদের গণমাধ্যম। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সাক্ষাৎকার সংকলন 'জলবায়ু জিজ্ঞাসা' তারই ধারাবাহিকতা। গত চার বছরে দৈনিক যুগান্তর ও দৈনিক সমকালে এসব সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। আমি আশা করি, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নেওয়া এসব সাক্ষাৎকার জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের কাজে লাগবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি আনন্দিত যে স্নেহভাজন শেখ রোকন সংবাদপত্র দুটিতে আমার সঙ্গে কাজ করার সময়ই সাক্ষাৎকারগুলো গ্রহণ করেছে। দীর্ঘ সময় ধরে বিচ্ছিন্নভাবে গৃহীত ও প্রকাশিত কিছু সাক্ষাৎকার এতদিন পর দুই মলাটে গ্রন্থিত হচ্ছে জেনে আরও ভালো লাগছে। বইয়ের জগতে নবীন 'আদর্শ' একজন তরুণ সাংবাদিকের বই প্রকাশের ঝুঁকি নিয়েছে। এ জন্য তারা আমাদের সাধুবাদ পেতে পারে।

প্রকৃতি ও পরিবেশ, বিশেষত নদী নিয়ে শেখ রোকনের আগ্রহের কথা আমি জানি। তার এ আগ্রহ ভবিষ্যতে আরও প্রগাঢ় হোক, এটুকুই প্রত্যাশা।

গোলাম সারওয়ার
সম্পাদক, দৈনিক সমকাল
২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

কৈফিয়ত ও কৃতজ্ঞতা

দুটি দৈনিক সংবাদপত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কিছু সাক্ষাৎকার কেন গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রয়োজন হয়, তার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে সবার আগে বিষয়ের কথা তোলাই সুবিধাজনক। এই সংকলনের সব সাক্ষাৎকারই জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট। আমার মনে আছে, ২০০৭ সালের নভেম্বরের ১৫ তারিখ বাংলাদেশের উপকূলে বিধ্বংসী ক্ষমতা নিয়ে আঘাত হেনেছিল ঘূর্ণিঝড় সিডর। এর গতি ও প্রকৃতি দেখে তখনই কেউ কেউ বলেছিলেন, এটা জলবায়ু পরিবর্তনের নমুনা। বিষয়টি বোঝার জন্য দিন দুয়েক পর বাংলাদেশে আইইউসিএনের তৎকালীন আবাসিক প্রতিনিধি ড. আইনুন নিশাতের কাছে গিয়েছিলাম। সদ্য স্নাতক সাংবাদিকের জন্য সেটা খানিকটা রোমাঞ্চকরই ছিল বটে। তার সঙ্গে কথোপকথন ওই মাসের ২২ তারিখে যুগান্তরে প্রকাশ হয়েছিল সাক্ষাৎকার আকারে। তারপর বিভিন্ন সময়ে ও প্রেক্ষাপটে বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠকের পক্ষ থেকে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে গেছি।

পরিবেশ-প্রকৃতির ব্যাপারে আমার ব্যাখ্যাহীন ও হাতুড়ে আগ্রহই সম্ভবত সর্বনাশা অথচ নতুন ইস্যুটির ব্যাপারে উৎসাহের উৎস। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করার সুবাদে প্রায় চার বছর ধরে গ্রহণ করা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সাক্ষাৎকার থেকে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক কথোপকথনগুলো আলাদা করতে গিয়ে মনে হয়েছে, ওই উৎসাহ একেবারে জলে যায়নি। জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের কাছে শুনে শুনে এই ইস্যুতে লেখালেখির খানিকটা আত্মবিশ্বাস তৈরি তো হয়েছেই; খোদ সাক্ষাৎকারগুলোও একত্রে আলাদা তাৎপর্য বহন করতে পারে। বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই, বৈশ্বিক ও সর্বব্যাপ্ত দুর্যোগটি নিয়ে গত চার বছরে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে যেসব চিন্তা-ভাবনা হয়েছে, তার পথরেখা পাওয়া যেতে পারে এই সংকলনে।

পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে প্রথমটিসহ বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকার এখানে সংকলিত করা গেল না। কারণ, গত চার বছরে দুই সংবাদপত্রে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের একাধিক সাক্ষাৎকার নিতে হয়েছে। কোনো ক্ষেত্রে আবার বিষয়েরও ব্যাপক পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ও প্রতিনিধিত্বশীল সাক্ষাৎকারটিকেই বেছে নিয়েছি। এই সংকলনে আইনুন নিশাতের প্রথম এবং শাইখ সিরাজের একমাত্র সাক্ষাৎকারটি বৃহত্তর অর্থে জলবায়ু পরিবর্তন mswkó বিবেচনায় গ্রন্থিত হলো। এই গ্রন্থে mwPe× করার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারগুলো প্রকাশ বা গ্রহণের সময়µম অনুসৃত হয়েছে। এতে করে ইস্যুটির ধারাবাহিকতা রক্ষা হবে আশা করা যায়। আইপিসিসি'র চেয়ারম্যান ড. রাজেন্দ্র কুমার পাচুরির একটি সাক্ষাৎকারও ইকনোমিস্ট থেকে ভাষান্তর করা হয়েছে যাতে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুর আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতটি বোঝা যায়। আবার উন্নয়নকর্মী জিয়াউল হক মুক্তা ও পরিবেশ আইনবিদ সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের সাক্ষাৎকার

দুটি আগে কোথাও প্রকাশ হয়নি। এই সংকলনের পরিকল্পনা মাথায় আসার পর সে দুটি গ্রহণ করেছি। আমি কৃতজ্ঞ যে তারা খুব স্বল্প সময়ের নোটিশে সাড়া দিয়েছেন। একজন তরুণ সাংবাদিককে আমলে নেয়ায় সাক্ষাৎকারদাতা সবার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা।

আমি সৌভাগ্যবান যে দুটি সংবাদপত্রেই জনাব গোলাম সারওয়ারের মতো সম্পাদকের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তিনি প্রশ্রয় না দিলে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ অথচ মূলধারার কিছুটা বাইরের ইস্যুতে এতগুলো সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্ভব ছিল না। কেবল তাই নয়, আমার আবদার মেনে খুব কম সময়ের মধ্যে তিনি একটি ভূমিকাও লিখে দিয়ে সংকলনটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

সমকালের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় আবু সাঈদ খান এসব সাক্ষাৎকার গ্রহণে যে উৎসাহ জুগিয়েছেন, সংকলন প্রকাশ করতে গিয়ে তা মনে পড়ছে। সমকাল ও যুগান্তরের সম্পাদকীয় বিভাগে আমার সহকর্মী শ্রদ্ধাভাজন অজয় দাশগুপ্ত, সোহরাব হাসান, সুভাষ সাহা, হাসান মামুনের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। আর দশটা বিষয়ের মতো এই সংকলনের ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন সহকর্মী মাহবুব মোর্শেদ। কৃতজ্ঞতা জানাই সহকর্মী সিরাজুল ইসলাম আবেদ, সাঈদ জুবেরী, মেহেদি রাসেল ও একরামুল হক শামীমকেও। সমকালের সম্পাদনা বিভাগের প্রধান শাখাওয়াত হোসেনসহ যুগান্তর ও সমকালের অন্যান্য সহকর্মীর প্রতিও কৃতজ্ঞতা। স্নেহভাজন তুহিন খন্দকার একটি সাক্ষাৎকার অনুলিখনের জটিল কাজটি করেছেন এবং অনুজপ্রতীম জাহিরুল ইসলাম ড. রাজেন্দ্র কুমার পাচুরির দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি ভাষান্তর করেছেন। দু'জনের জন্যই শুভ কামনা।

যুগান্তর কিংবা সমকালের সঙ্গে যুক্ত না থাকা সত্ত্বেও আরও দু'জনের নাম আলাদা করে বলতেই হবে। 'আদর্শ'-এর বন্ধুবর মাহাবুবুর রাহমান ও আমার স্ত্রী নুসরাত জাহানের উৎসাহ ও তাগাদা ছাড়া এই সংকলন আলোর মুখ দেখত কি-না সে সন্দেহ রয়েই গেল।

শেখ রোকন
২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

ড. এ আতিক রহমান

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ও দারিদ্র্য একই সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে

বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজের (বিসিএএস) নির্বাহী পরিচালক ড. এ আতিক রহমান জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বৈশ্বিক সংস্থা আইপিসিসির চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের অন্যতম লিড অথর ছিলেন। পরিবেশের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য জাতিসংঘ পরিবেশ সংস্থা (ইউএনইপি) তাকে ২০০৮ সালের এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণার জন্য বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদফতর তাকে 'এনভায়রনমেন্ট এওয়ার্ড ২০০৮' প্রদান করে। ড. আতিক রহমান বোস্টনের টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর। এর আগে প্রায় দেড় দশক তিনি অক্সফোর্ড ও এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও গবেষণা করেন। তিনি ১৯৭৭ সালে লন্ডনের ব্রুনেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ড. আতিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক।

শেখ রোকন: ব্রিটিশ সংবাদপত্র ইন্ডিপেনডেন্টের সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০৭১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ তলিয়ে যাবে। এ আশংকা কতটা সত্য?

আতিক রহমান : না সম্পূর্ণ ডুবে যাবে না। তবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বেই। আইপিসিসি রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৮৯-৯০ সেমি বেড়ে যাবে। আইপিসিসির চতুর্থ রিপোর্টের পর আরও যেসব রিপোর্ট ও আর্টিকেল বেড়িয়েছে খুব বিখ্যাত এবং সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক, সেখানে বলা হচ্ছে, মেরু অঞ্চলের বরফ আশংকার চেয়ে দ্রুততর গলছে। বাংলাদেশ কর্কটক্রান্তি অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে তাপমাত্রা এক-দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে মেরু অঞ্চলে বাড়বে ছয় ডিগ্রি। তাতে বরফ অনেক দ্রুত হারে গলবে। আরও কিছু সূচকে দেখা যাচ্ছে, বরফ গলাটা বাড়বে। এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে এবং দেশের অনেক অভ্যন্তরের অঞ্চল পর্যন্ত তলিয়ে যাবে। কতটা যাবে। এ মুহূর্তে সেটা বলা মুশকিল। আগে হিসাব করা হয়েছিল, এক মিটার উচ্চতা বাড়লে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১৭ ভাগ তলিয়ে যাবে। বরফ গলার হার বেড়ে যাওয়ায় সেটা আরও বাড়তে পারে।

শেখ রোকন: জলবায়ুর পরিবর্তন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ কী ধরনের বিপদের সম্মুখীন হবে?

আতিক রহমান : দক্ষিণাঞ্চলের ১৭ ভাগ অঞ্চল পানিতে তলিয়ে গেলে ১৩ ভাগ কৃষি বিনষ্ট হবে। সাইক্লোনের সংখ্যা এবং গতি দুটোই বেড়ে যাবে। সাইক্লোনের ক্ষতি আরও বাড়বে। একদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা অন্যদিকে সাইক্লোন বাড়বে। দুটোর সমন্বয়ে পানি স্থলভাগের অনেক ভেতরে চলে আসবে। সাইক্লোনের সবচেয়ে প্রাণঘাতি দিক হচ্ছে জলোচ্ছ্বাস। তখন এটা আরও তীব্র হবে এবং অনেক অভ্যন্তরে চলে আসবে। বেশি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এবং জলোচ্ছ্বাসের আওতা বাড়ার ফরে লবণাক্ত পানিও অনেক ভেতরে চলে আসবে। ফলে আমাদের দক্ষিণাঞ্চলে মাটি ও পানির লবণাক্ততা বেড়ে যাবে এবং খাদ্য উৎপাদন কমে যাবে। সুন্দরবনের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। বনের পরিধি কমে যেতে পারে, হারিয়েও যেতে পারে।

আরেকটি বিপদ হচ্ছে হিমালয়ের যে বরফ রাশি বা হিমবাহ থেকে গঙ্গা-ব্রাহ্মপুত্রের মতো নদীগুলোর উৎপত্তি, সেগুলো গলতে শুরু করেছে। গত ২০ বছরে গঙ্গোত্রি হিমবাহ ৮৬ মিটার পিছিয়ে গেছে। এখন আরও দ্রুতগতিতে গলছে। নেপাল-ভুটানে আগেই দেখা গিয়েছিল। সেখানে হ্রদের পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছর পাকিস্তানিরাও জানিয়েছে, সেখানে বড় বড় নতুন লেক তৈরি হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে বরফ গলা পানি। বেশি বরফ গলার জন্য মধ্য বাংলাদেশে জলাবদ্ধতা দেখা দেবে। কারণ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ায় নদীবাহিত পানির সরবে না। বাংলাদেশের প্লাবন ভূমিতে বন্যা আরও বাড়বে। নদীভাঙন বাড়বে। নদীগুলোর তলদেশ আরও উঁচু হবে। ফলে বন্যার পৌনপনিকতা ও ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।

আরও বিপদ আছে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বরেন্দ্রভূমি আরও শুস্ক হয়ে যাচ্ছে। সব সূচকই তাই বলছে। ওই অঞ্চলে যে শস্য হতো, সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। আইপিসিসি বলছে, গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় ২০৩০ সাল নাগাদ ২০-৩০ শতাংশ খাদ্য উৎপাদন কমে যাবে। ফলে খাদ্যাভাব ও দারিদ্র বৃদ্ধি পাবে।

কবিতা, প্রকৃতি এবং জীবন যেখান থেকেই হোক আমরা এখন জানি কোন মাসে কেমন বৃষ্টিপাত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এর মধ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। এর ফলে চাষীরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। সব মিলিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবে।

শেখ রোকন : জলবায়ু পরিবর্তনের কোন প্রভাব এ মুহূর্তেই কি শুরু হয়েছে?

আতিক রহমান : হ্যাঁ, দু-তিনটি প্রভাবের কথা এখনই বলা যায়। আমরা দক্ষিণাঞ্চলে গিয়ে প্রবীণদেরকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, অমাবস্যা-পূর্ণিমার সময় যে বড় জোয়ার সেটার উচ্চতা অনেক বেড়েছে। খেপুপাড়া-কুয়াকাটার দিকে গেলে দেখা যাবে, মানুষ তাদের ভিটে উঁচু করছে। আগের উচ্চতায় কুলাচ্ছে না।

দক্ষিণাঞ্চলে আগের মতো সুপেয় পানি পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে লবণাক্ততা বাড়ছে। এদিকে উত্তর থেকে আসা সুপেয় পানির প্রবাহ কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে দক্ষিণের লবণাক্ততা বাড়ছে। সিডরের মতো শক্তিশালী ভয়াবহ সাইক্লোন আগে আমরা দেখিনি। আইপিসিসির অনুমানের সঙ্গে এটা মিলে যায়। ২০০৭ সালে দুটো বন্যা হয়েছে একই বর্ষা মৌসুমে। এর আগে একই বছর দুটো বড় বন্যা হয়নি। একই মৌসুমে দুটো বন্যা হওয়ার নজির নেই। অন্তত আমার জানা নেই। একটা প্রচণ্ড কিছু যে হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যে পড়তে শুরু করেছে- এগুলো তারই ইঙ্গিত।

শেখ রোকন : এ পরিবর্তনের কারণ কী, সংক্ষেপে যদি বলেন।

আতিক রহমান : জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ হচ্ছে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন। বর্তমানে উন্নত রাষ্ট্রগুলো গত দুইশ' বছর ধরে এ গ্যাস উৎপাদন করেছে। তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে যে পরিবেশগত ক্ষতি হয়েছে, যে কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন উৎপন্ন হয়েছে, সেটা বায়ুমণ্ডলে আটকে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, জাপানের মতো দেশগুলোর দুশ' বছরের দাহনের ফলে বৈশিবক জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। আমাদের বায়ুমণ্ডল অনেক বড়, কিন্তু বর্তমানে এর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

শেখ রোকন : এতে বাংলাদেশের দায় কতটুকু?

আতিক রহমান : বাংলাদেশের দায় খুবই কম। বাংলাদেশের মাথাপিছু দুশ' কেজির মতো প্রতিবছর কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন হয়। গ্রামের একটি সাধারণ পরিবার হয়তো সন্ধ্যাবেলা থেকে দেড়-দু'ঘণ্টা একটা কুপি জ্বালায়। তারা যে খুড়কুটো জ্বালায়, সেটা পরবর্তী বছরে তাদের কৃষি ও প্রকৃতি রীতিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা ঐ পরিমান কার্বণকে শুষে নেয়। কার্বন ডাই অক্সাইড হিসেবে বায়ুমণ্ডলে জমে না। যতটুকু জমে সেটা হিসেবে আসে না। বাংলাদেশের শহরের লোকজনেরইবা ক'টা এয়ার কন্ডিশনার আছে? কজনের একাধিক গাড়ি আছে? ভারতে বা পাশ্চাত্যে শতাব্দী ধরে কয়লা পোড়ানো হচ্ছে, আমরা সেটা করি না। ইউনিট প্রতি জ্বালানি পোড়ালে সবচেয়ে বেশি কার্বন বেড় হয় কয়লায়, তারপর পেট্রল এবং তারপর প্রাকৃতিক গ্যাসে। আমাদের সৌভাগ্য, আমরা প্রথমেই প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে শুরু করেছি।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আমাদের করণীয় কী কী হতে পারে?

আতিক রহমান : বাংলাদেশের সবাই যদি আগামী কাল থেকে কোন গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন না করে, তাহলে কি আমরা জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে পারবো?

না। আমরা খুব কম উদগীরণ করি। বলা হয় গোটা বাংলাদেশ যতটা গ্রীন হাউজ গ্যাস উদগীরণ করে, শুধু নিইউর্য়ক সিটি তারচেয়ে বেশি কার্বন করে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যারা দায়ী, তাদেরকেই গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন কমাতে হবে। আইপিসিসি স্পষ্ট বলেছে, ২০৫০ সালের মধ্যে ৮০ শতাংশ গ্রীন হাউজ উদগীরণ কমাতে হবে। তা না হলে প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে যাবে। প্যানেলের চেয়ারম্যান রাজেন্দ্র পাচুরি সম্প্রতি বলেছেন, আমাদের হাতে সময় খুব কম। বিলম্বে ব্যবস্থা নিলে আমরা গ্রীন হাউজ গ্যাস উদগীরণ কমাতে পারব না। পাশ্চাত্য দেশগুলোকেই আগে গ্রীন হাউজ গ্যাস কমাতে হবে। তারপর চীন, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো নতুন অর্থনৈতিক শক্তিগুলোকে জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারে সাশ্রয়ী হয়ে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমাতে হবে। পদ্ধতিটি হবে ডিকার্বোনাইজেশন অব ডেভেলপমেন্ট। উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে কিন্তু কার্বন কমাতে হবে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, যতই কার্বন নির্গমন কমানো হোক, জলবায়ুর পরিবর্তন যা হওয়ার ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। এখন আমাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে। বাংলাদেশের জন্য এটাই জরুরি।

শেখ রোকন: ডিকার্বোনাইজেশনের দিক থেকে বাংলাদেশের কী করার আছে?

আতিক রহমান : অল্প কিছু করার আছে। সব সাধারণ বাল্ব-এর বদলে যদি আমরা এনার্জি সেভিং বাল্বে চলে যাই তাহলে বর্তমানের বিদ্যুৎ ঘাটতি বহুলাংশে পুরণ হবে। পাকা বাড়ি ও বহুতল ভবনগুলোতে যদি পোড়া ইট ব্যবহার না করে অন্য ধরনের ইট (রোদ্রে শুকানো কমপ্যাক্ট ইট) ব্যবহার করতে পারি তাহলে সুবিধা হবে। যানজট কমিয়ে ফেলতে পারলে গাড়ির জ্বালানি কম পুড়বে এবং কার্বন কম উদগীরণ হবে। উন্নতর গাড়ি হলেও সেটা কমবে। আমরা গাছ লাগিয়েও নির্গমন কমাতে পারি।

শেখ রোকন: আপনি বাংলাদেশের করণীয় সম্পর্কে বলছিলেন।

আতিক রহমান : লবণাক্ততার কারণে শস্য উৎপাদন কমে যাবে বা কোন কোন অঞ্চলে শস্য হবে না। এজন্য আমাদের লবণ সহিষ্ণু শস্য উদ্ভাবন করতে হবে। এ নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে। বিআর-৪৮ নামে একটি ধানের উদ্ভাবন করা হয়েছে। কিন্তু সে ধানের উৎপাদন অনেক কম। এটা বাড়াতে হবে। মঙ্গা এলাকায় এমন কিছু ধান চাষ করা হচ্ছে যা শুকনো মৌসুমেও টিকে থাকে। এর উৎপাদন বাড়ানোর কাজ করতে হবে। বরিশাল অঞ্চলের মানুষ কচুরিপানা জড়ো করে এক ধরনের ভাসমান বাগান তৈরি করে তার ওপর লাউ, কুমড়া লাগায়। এটার সম্প্রসারণ প্রয়োজন হবে। উন্নত চুলা করে অল্প কাঠে যাতে অধিক রান্না হয় সে ব্যবস্থা নিতে হবে। বায়োগ্যাস করে গোবর পচে যে মিথেন গ্যাস বের হয় সেটা কমাতে পারি। ঢাকা শহরে গার্হস্থ্য বর্জ্য কম্পোস্ট করতে পারি। এর মিথেন বিদ্যুৎ

উৎপাদন কাজে লাগাতে পারি। যেসব এলাকায় এখনও বিদ্যুৎ নেই সেখানে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারি। সৌর তাপ দিয়ে পানি গরম করে আমরা বাড়িতে, হাসপাতালে ব্যবহার করতে পারি। এগুলো হচ্ছে মিটিগেশন।

শেখ রোকন: খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে আমরা কী কী করতে পারি।

আতিক রহমান : মিটিগেশনের পাশাপাশি এডাপ্টেশনটা বা অভিযোজন খুব জরুরি। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কৌশল যেমন, এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার ব্যবস্থাও মানুষকে শেখাতে হবে। সেই এডাপ্টেশনই কাজে লাগবে যেটা উন্নয়নে সাহায্য করে। দক্ষিণাঞ্চলে মানুষকে সরাতে না চাইলে চার-পাঁচতলা উঁচু বাড়ি করতে হবে। নিচতলা খোলা রাখলে বন্যা আসবে এবং চলে যাবে। গরিব মানুষ এর খরচ বহন করতে পারবে না। সরকার এমন কিছু বাড়ি করে দিতে পারে। আরও কিছু সাইক্লোন শেল্টার করা যেতে পারে। গ্রামের কোন বড়লোক হয়তো কাঠের বড় বাড়ি করতে চায়। সরকার থেকে কিছুটা সাহায্য দিয়ে বিল্ডিং করে দেয়া যেতে পারে। গ্রামের লোকজন সেখানে আশ্রয় নিতে পারে। এগুলো হচ্ছে স্ট্রাকচারাল এডাপ্টেশন। আবার নতুন সুন্দরবন তৈরি করে সাইক্লোন-জলোচ্ছ্বাসের আঘাত কমিয়ে দেয়া যেতে পারে। যেসব বাঁধ ও পোল্ডার রয়েছে, সেগুলোকে আরও উঁচু ও শক্তিশালী করতে হবে। লোকজনের জন্য সুপেয় পানি ও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করে দেয়া যেতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কাগুলোর সঙ্গে উন্নয়নের বিষয় সমন্বয় করে নতুনতর উন্নত পদ্ধতিতে জনগণকে অভ্যস্ত করতে হবে।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা এবং এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার তো একটা খরচ আছে।

আতিক রহমান : হ্যাঁ, এতে খরচ আছে। এ খরচটা কে দেবে? বলা হচ্ছে, পলুটারস পে। যে দূষণ করেছে তাকে এ ব্যয় বহন করতে হবে। তারা কারা আমরা সবাই জানি। ক্লাইমেট কনভেনশনের এনেক্স ওয়ানে লেখা আছে। ধনী ও শিল্প উন্নত দেশগুলো এর জন্য বেশী দায়ী। অথচ দরিদ্র দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের ফলাফল ভোগ করবে অনেক বেশী মাত্রায়। আইপিসিসির চতুর্থ রিপোর্টে স্পষ্ট এসেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য কে কি মাত্রায় দায় বহন করবে। ইংরেজিতে বলে বার্ডেন শেয়ারিং। আমাদের এখন কমন বাট ডিফারেনশিয়েট রেস্পন্সিবিলিটি নিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নততর দেশগুলোকে দায় নিয়ে উন্নয়নশীলদের সহায়তা দিতে হবে। আমাদের মতো স্বল্পোন্নত অথচ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে টাকা, সম্পদ প্রযুক্তি দিতে হবে।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আমরা কতটা অগ্রসর হতে পেরেছি?

আতিক রহমান : খুব বেশি পারিনি। সচেতনতা একদমই ছিল না। তবে সচেতনতা এখন অনেক বেড়েছে। সরকারও খুব সচেতন। যে কোন সরকারকে সচেতন হতে হবে। কারণ আইপিসিসির চতুর্থ রিপোর্টে বিষয়টি স্পষ্ট বলা হয়েছে। আগে দ্বিধা ছিল। এখন কোন দিধা নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ দেখা দিচ্ছে। আমাদের আরও সচেতন হতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি শিক্ষাক্রমে ঢোকাতে হবে। ছাত্রছাত্রী, বাড়ির মহিলাদের বোঝাতে হবে। এখন বেশিরভাগ মানুষই বিষয়টি নিয়ে উরু উরু কথা শুনছে। এটাকে সামগ্রিকভাবে, সুনির্দিষ্টভাবে, অন্তর্নিহিত করে বোঝাতে হবে।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কিছু উন্নত রাষ্ট্রও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশের মতো দেশের সঙ্গে তাদের প্রস্তুতির বিষয়টি কিভাবে তুলনা করবেন?

আতিক রহমান : আমাদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে নেদারল্যান্ডসের। ওই দেশটিও আমাদের মতো সমতল। আমাদের মতোই সমুদ্রের হুমকির মুখে। তবে আমাদের মতো বড় নদী নেই। তাদের রাইন খুবই ছোট নদী– পদ্মা, মেঘনার মতো বিশাল বিস্তৃত নয়। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নেদারল্যান্ডসের অর্থের অভাব নেই। ফিলিপস, সেল, ইউনিলিভারের মতো বড় কোম্পানিগুলো এজন্য এগিয়ে এসেছে। নেদারল্যান্ডসের সমুদ্রতীরবর্তী বাঁধ এক মিটার উঁচু করতে এক বিলিয়ন ডলার খরচ হবে। সেটা তারা ব্যাংকে জমা রেখেছে। বাংলাদেশের তো এত টাকা নেই। একই সঙ্গে বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তা বিধান করতে হবে এবং ভবিষ্যতের উন্নয়নও করতে হবে। নেদারল্যান্ডসের মতো দেশগুলোর নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে, বাংলাদেশের মতো দেশকে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়া। তবে এটা আগের সাহায্যগুলোর সঙ্গে মেলালে চলবে না। শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতে আগে যে সহায়তা দেয়া হতো সেটা ঠিক রেখেই জলবায়ু ইস্যুতে নতুন সহায়তা দেয়া হবে। এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে।

বাংলাদেশের সুবিধা হচ্ছে, এখানকার জনগোষ্ঠী দুর্যোগ মোকাবেলায় অভ্যস্ত। এ দেশের বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও বড় বড় কাজ করেছে। আমরাও গত ২০ বছর ধরে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করছি। বিশেষর বড় বড় বিশবিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান আমাদের সম্পর্কে জানে। আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র্য। একই সঙ্গে দারিদ্র্য ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। সরকারকে তো আগে দারিদ্র্যের দিকটা দেখতে হয়। আবার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা না করতে পারলে দারিদ্র্য বেড়ে যাবে। দারিদ্র্য ও জলবায়ু পরিবর্তন কিভাবে মোকাবেলা করা যায়– এ নিয়ে আমরা এখন গবেষণা করছি। একইসাথে আমাদেরকে জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলা ও দারিদ্র্য নিরসন করতে হবে। এটা খুব কঠিন কাজ। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি চিন্তাভাবনা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে

আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের গতানুগোতিক মানষিকতা একটি বড় বাধা। তারা শুধু নিজের মেয়াদের জন্য চিন্তাভাবনা করে থাকে। এর জন্য সরকারি নীতি অব্যাহত থাকতে হবে। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হবে। কৃষি, মৎস্য, বন, পশুপালন বিভাগকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

শেখ রোকন: সরকারের পক্ষে তো ক্লাইমেট চেঞ্জসেল এবং ন্যাশনাল প্লান অব অ্যাকশন করা হয়েছে।

আতিক রহমান : ন্যাশনাল প্লান অব অ্যাকশন বা নাপা করা হয়েছিল। কিন্তু এটার উদ্দেশ্যই ছিল সীমিত। এটা কোন পরিকল্পনা নয়, কৌশলপত্র নয়, নীতিমালাও নয়। নাপাতে আছে জরুরি ও তাৎক্ষণিক কিছু কাজের তালিকা। এটা করা হয়েছিল বিশেষ কারণে। এখন সেটাকে সদূরপ্রসারী করতে হলে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি সমন্বয় করতে হবে।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বৈশ্বিক কী কী উদ্যোগ রয়েছে?

আতিক রহমান : ১৯৯২ সালে জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে ক্লাইমেট কনভেনশন হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে কিয়োটো প্রটোকল নামে একটি ডকুমেন্ট তৈরি হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল ২০১২ সালের মধ্যে উন্নত দেশগুলো শতকরা ৫৪ ভাগ গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন কমাবে। কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে ২০১২ সালে। এ সময়ের মধ্যে ধনী দেশগুলোকে অনেক কিছু করতে হবে। ২০১২ সালের পরের করণীয় এখনই ঠিক করতে হবে। ২০০৯ সালে কোপেনহেগেনে এ নিয়ে আরেকটি মিটিং হবে। গত বছর বালি সম্মেলনে মোটামুটি সিদ্ধান্ত হয়েছে, চারটি ক্ষেত্রে আমাদের গভীরভাবে জোর দিতে হবে। একটি হচ্ছে মিটিগেশন বা গ্রিনহাউজ গ্যাস কমানো; দ্বিতীয়ত, হচ্ছে অভিযোজন বা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া; তৃতীয়ত, হচ্ছে প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও হস্তান্তর। অর্থাৎ নতুন জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তির উদ্ভাবন করতে হবে এবং বর্তমান প্রযুক্তিকে স্বল্পমূল্যে গরিবের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। চতুর্থ হচ্ছে অর্থায়ন। টাকা কোথায় পাওয়া যাবে, কিভাবে পাওয়া যাবে। এ নিয়ে নানা চিন্তাভাবনা চলছে। ছোট ছোট তহবিল তৈরি হচ্ছে। এগুলো একসময় বড় তহবিলে পরিণত হবে।

শেখ রোকন: আঞ্চলিক সহযোগিতা কতদূর এগিয়েছে?

আতিক রহমান : আপনি জানেন, গত মাসে ঢাকায় সার্ক পরিবেশ মন্ত্রীদের সম্মেলন হয়েছে। হিমালয়ান ড্রেইনেজ ইকোসিস্টেমে যে আঘাত আসবে সেটা ভারত, বাংলাদেশ বা নেপাল একার পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। এজন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। ব্যাপক গবেষণা করতে হবে এবং উপাত্ত বিনিময় করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সরকারগুলোকে

একত্রে কাজ করতে হবে। এই অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনে ফুড ব্যাংক করতে হবে।
দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র এলাকা। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবও এখানেই সবচেয়ে বেশি পড়বে। আমাদের মধ্যে পানির মতো কিছু বিষয়ে ঝগড়া আছে। সেগুলো থেকে বেরোতে হবে। কারণ জলবায়ুর দানব হচ্ছে বাইরের। তার বিরুদ্ধে সবাই একত্র হয়ে লড়াই করতে হবে।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বাংলাদেশের অর্থায়ন সম্পর্কে কিছু বলুন।
আতিক রহমান : একটা শুভ লক্ষণ হচ্ছে, চলতি বাজেটে বর্তমান সরকার ৩০০ কোটি টাকার একটা তহবিল তৈরির কথা বলেছে। ৩০০ কোটি বড় কথা নয়, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বাজেটে হেডলাইন তৈরি হয়েছে, সেটা বড় কথা। এটা চিন্তা-ধারার পরিবর্তনের ইঙ্গিত। সেপ্টেম্বরের প্রথমদিকে লন্ডনে বাংলাদেশে জলবায়ু মোকাবেলা বিষয়ে একটা উচ্চ পর্যায়ের আন্তসরকার সভা হবে। সেখানেও এ ধরনের তহবিল আসবে। তবে সেটা একান্তই অনুদানভিত্তিক হতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য স্বল্প নয়, বড় বড় অবকাঠামোর জন্য অন্যভাবে ঋণ নিতে পারে সরকার। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি হতে হবে ধনী দেশগুলোর জন্য ক্ষতিপূরণমূলক। গ্লোবাল এডাপ্টেশন ফান্ড, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফান্ড বলে আরও দু-একটি ফান্ডিং মেকানিজম রয়েছে। গ্লোবাল এডাপ্টেশন ফান্ড নিয়ে একটা কমিটি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেটার সদস্য। ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজমের সিস্টেমের শতকরা দুই ভাগ নিয়ে একটা ফান্ড হবে। কিয়োটো প্রটোকলে অন্য দুটো ম্যাকানিজম আছে, সেগুলোর অর্থও আসতে হবে। এ ফান্ড কে পাবে? আমাদের দেশ, না অন্য দেশ পাবে? জনগণ পাবে না সরকার পাবে। এখনও গাইড লাইন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে।

শেখ রোকন: বাংলাদেশ কি ইতিমধ্যে কোন ফান্ড হাতে পেয়েছে?
আতিক রহমান : অল্প কিছু ফান্ড নিয়ে কথা চলছে। প্রথম নাপার একটা প্রকল্প পেয়েছে ছয় বা আট মিলিয়ন ডলার। সেটাও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আটকে আছে। এগুলোতে সময় লাগে। গবেষণা করতে হয়। কাগজ তৈরি করতে হয়। একটা এফিশিয়েন্ট কাউন্টারপার্ট এজেন্সি লাগবে। সেখানে উৎসাহী মানুষ থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক অর্থ আনা অনেক ঝামেলার কাজ।

শেখ রোকন: শোনা যাচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তন ফান্ড নিয়ে সরকারের মধ্যে দুই মত রয়েছে। কেউ ঋণ নিতে চাইছে, কেউ চাইছে অনুদান।

আতিক রহমান : এটাকে আমি খুব বড় ব্যাপার মনে করছি না। সরকারের ভেতরে চিন্তাধারায় ব্যবধান থাকতেই পারে। আমরা ১৯৯২ সালে ক্লাইমেট চেঞ্জ কনভেনশন সই করেছি। আজকে ২০০৮। গত ১৬ বছরে আমরা নেগোসিয়েট করেছি একটা নীতির ভিত্তিতে। সেটা হল আমরা অনুদান নেব ন্যায্য হিস্যা হিসেবে, ক্ষতিপূরণ হিসেবে। ঋণ আমরা নিতে চাই না। স্বল্পোন্নত দেশগুলোরও অবস্থান অভিন্ন। অন্য চিন্তা হচ্ছে, অনুদান দিলে তো কম অর্থ দেবে। বড় বাঁধ করতে তো অনেক টাকা দরকার। তাহলে কি ঋণ নেব না? তারা বলছে বড় কাজের জন্য ঋণ নিতে হবে। সে ঋণের পদ্ধতিও ভিন্ন হবে।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য বাংলাদেশের কী পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, সেটা কি নির্ধারণ করা সম্ভব?
আতিক রহমান : সম্ভব। তবে কস্ট অব এডাপ্টেশন আমরা এখনও করিনি। কেউই করেনি। চিন্তা-ভাবনা চলছে এখন। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংকের একটা টিম এসেছিল। তারা চেষ্টা করছে। আমরা গবেষণা, আলাপ-আলোচনা করছি। তবে বিষয়টি সহজ নয়। কিছু সময় লাগবে।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তো অনেক মানুষের প্রয়োজন হবে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে।
আতিক রহমান : প্রচুর মানুষের প্রয়োজন হবে। আমরা ক'জন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি? একশ'জন লোক। আমাদের দরকার ৫০ হাজার মানুষ। সেই সচেতন ও শিক্ষিত মানুষ কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয়ে কি পড়ানো হচ্ছে? শিক্ষকরা কি প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। সরকার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কয়েকজনকে। আমরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি কিছু মানুষকে। আমাদের দরকার হাজার হাজার কর্মী তৈরী করা।

শেখ রোকন: গবেষণাও তো প্রয়োজন। সেটা কতখানি হয়েছে?
আতিক রহমান : বেসরকারি পর্যায়ে গবেষণার কাজ এগিয়েছে বেশি। সরকারি পর্যায়ে এগোচ্ছে ধীরে ধীরে। তবে আগের চেয়ে গতি বেড়েছে। কিন্তু আমাদের যে পরিমাণ গবেষণা প্রয়োজন, তার তুলনায় এটা অপ্রতুল।

শেখ রোকন: সাধারণ মানুষের অবস্থা কেমন?
আতিক রহমান : মানুষ বুঝতে পারছে যে, আবহাওয়ায়, পরিবেশ ও প্রতিবেশে নানা পরিবর্তন আসছে এবং তা তাদের জীবন জীবেকাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কিন্তু এজন্য তাদের কী করণীয়, সে প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছে না। এক্ষেত্রে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকার, গণমাধ্যম এবং সংশ্লিষ্টরা জরুরিভিত্তিতে কাজ করতে পারে।

দৈনিক যুগান্তর
২০ আগস্ট, ২০০৮

ড. আইনুন নিশাত

উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণে প্রকৃতির চাহিদা বিবেচনা করা হয়নি

পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়–বুয়েটের পানিসম্পদ প্রকৌশল বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন দীর্ঘদিন। বর্তমানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। গত বছর সেখানে যোগ দেয়ার আগে ১৯৯৮ সাল থেকে ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন ইউনিয়ন বা আইইউসিএন'র আবাসিক প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। পানিসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, জলাভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আইনুন নিশাত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। ন্যাশনাল ওয়াটার কাউন্সিল, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিষদ এবং ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনে সদস্য হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ফোরাম কিয়েটো প্রটোকলে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগকালীন 'স্টান্ডিং অর্ডার' প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণে মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করেছেন। কর্মজীবনে কিছুদিন পানি উন্নয়ন বোর্ডে ছিলেন। ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি বুয়েটের শিক্ষকতায় যোগ দেন। ১৯৮১ সালে তিনি স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোর স্ট্র্যাচলাইড ইউনিভার্সিটি থেকে নদীর গতি-প্রকৃতি বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

শেখ রোকন: বাতাসের গতিবেগ ও জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা সিডরের চেয়ে কম থাকা সত্ত্বেও আইলায় উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ সীমাহীন দুর্গতির মুখে পড়েছে। এর কারণ কি?

আইনুন নিশাত: বাংলাদেশের উপকূল চিরকালই জলোচ্ছ্বাস আর ঘূর্ণিঝড়ে পড়েছে, বিষয়টি নতুন নয়। কিন্তু আইলার একটি বিশেষ প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দিতে চাই আমি। সেটা হচ্ছে আবহাওয়াবিদরাও আইলার সাথে কতটা জলোচ্ছ্বাস হবে, সে পূর্বাভাস দিতে পারেননি। তারা ঠিক হিসাব করে উঠতে পারেননি, ভরা কটালের মাথায় জলোচ্ছ্বাস আসবে। যে কারণে সিডরের সময় ১০ নম্বর দেয়া হলেও এবার ঘোষণা করা হয়েছিল ৭ নম্বর বিপদ সংকেত। কিন্তু তাদের উচিত ছিল জোয়ার ভাটার হিসাব ঠিকমত করা। ঘূর্ণিঝড় আর ছয়-সাত ঘণ্টা পরে

আঘাত হানলে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা অনেক কম হতো। অবশ্য দিনের বেলায় আঘাত হানায় প্রাণহানী অনেক কম হয়েছে।
আইলার আরেকটি বিশেষ দিক হচ্ছে এর গতিপথ। এর আগের প্রায় সব ঘূর্ণিঝড় অক্ষরেখার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণা থেকে এসে উত্তর-পুব দিকে অগ্রসর হতো। যে কারণে সেগুলো ভূমিতে এসে দুর্বল হয়ে পড়তো। কিন্তু আইলার গতিপথ ছিল পুরোপুরি নতুন। চট্টগ্রামের উপকূল ঘেঁষে নোয়াখালী, পটুয়াখালী, বরগুনা, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে গেছে।

শেখ রোকন: আইলার আঘাত মারাত্মক হওয়ার জন্য উপকূলীয় বাঁধের দুর্বলতাকে দায়ী করা হচ্ছে। আপনি কী বলেন?
আইনুন নিশাত: উপকূল রক্ষায় বাঁধ নির্মাণের বিষয়টিও নতুন নয়। একশ বছর আগের ইতিহাসেও আমরা দেখতে পাব, জলোচ্ছ্বাসের আশংকা দেখা দিলে উপকূলীয় অধিবাসীরা বাঁধের দুর্বল অংশ মেরামতের জন্য কোদাল নিয়ে মাঠে নামতেন। জলোচ্ছ্বাসে বাঁধের সাথে সাথে তাদের ভেসে যাওয়ার নজিরও কম নয়। আইলার ক্ষেত্রে, আমার ধারণা, জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বাঁধের চেয়ে বেশি ছিল। সংবাদমাধ্যমে যে উচ্চতার কথা বলা হয়েছে, সেটা সম্ভবত সঠিক নয়। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে উপকূলীয় বাঁধও দুর্বল ছিল, অস্বীকার করছি না। সিডরের পর বাঁধ মেরামতের জন্য আমরা বারবার অনুরোধ করেছি। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে এ ধরনের জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় যে ঘন ঘন হবে, এটা এখন বিশেষজ্ঞ মহলে স্বীকৃত। এজন্য আমি মনে করি সমগ্র উপকূলকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

শেখ রোকন: ষাট থেকে সত্তরের দশকে বাঁধ-নেটওয়ার্কটি নির্মিত হয়েছিল gলত জলোচ্ছ্বাস ও লবণপানি থেকে উপকূলীয় অঞ্চলকে রক্ষার জন্য। সেটা কতটা সম্ভব হয়েছে?
আইনুন নিশাত: একথা সত্যি যে উপকূলের বর্তমান নেটওয়ার্কটি ষাটের দশকের শেষভাগে তৈরি হয়েছিল। সত্তরের দশকে সেটা আরেকটু বি¯ত করা হয়। আশির দশকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার উপকূলেও সেটা সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু বাঁধের নেটওয়ার্ক প্রাচীন বাংলার A¯ত্বের মতোই পুরানো। চীনা ভাষায় বাংলা হচ্ছে বাঁধের দেশ। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস সম্পর্কিত বইগুলোতে পলাশীর যুদ্ধের সময়কার বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিkষণ রয়েছে। সেখানে বলা বলা হয়েছে যে ব্রিটিশ সাহেবরা আমাদের উপকূলে বাঁধের নেটওয়ার্ক দেখে বাংলাদেশকে নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সেসব বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ হতো স্থানীয় জনসাধারণে উদ্যোগে। পঞ্চাশের দশকে এসে আমরা স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোকে দুর্বল হয়ে যেতে দেখি। যার ফলে অষ্টমাসী ওই বাঁধগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং ষাটের দশকে এসে সরকার নতুন করে নির্মাণ কাজ হাতে নেয়।

নতুন ব্যবস্থায় বাঁধের স্থানে স্থানে স্লুইস গেইট ও রেগুলেটর তৈরি করে স্বাভাবিক জোয়ার-ভাটা সঞ্চালনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। স্থানীয় প্রযুক্তির বাঁধগুলো আট মাস বন্ধ থাকলেও চার মাস জোয়ার-ভাটা চলাচল করতে পারতো। কিন্তু সরকারি বিশেষজ্ঞরা প্রকৃতির চাহিদা বুঝতে না পারায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের গাঙ্গেয় অববাহিকায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুরু হয়। ষাটের দশকে ওই ধরনের বাঁধ নির্মাণের ফলে আশির দশকে এসে দেখা গেল বিভিন্ন নদীর তলদেশ পাশের ভূমি থেকে উঁচু হয়ে গেছে। ওই অঞ্চল ২০-২৫ বছর বাঁধের উপকারিতা পেলেও এখন পরিস্থিতি খুবই খারাপ।

শেখ রোকন: কার্যকারিতা হারানোর কারণ হিসেবে চিংড়ি ঘেরে নোনা পানি টেনে আনাকে দায়ী করা হচ্ছে।
আইনুন নিশাত: বর্তমানে যে বাঁধের বহু জায়গাতেই অবস্থা ভালো নয়, এর অন্যতম প্রধান কারণ অবশ্যই ঘের মালিকদের উৎপাত। আগে তারা বাঁধ কেটে নোনা পানি ঢুকতো। এখন স্থায়ী পাইপ বসিয়েছে। লক্ষ্য করবেন, জলোচ্ছ্বাসের আশংকা দেখা দিলে তারা জনরোষের ভয়ে এলাকা থেকে উধাও হয়ে যায়। আরেকটি প্রধান কারণ অবশ্যই রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। ষাটের ও সত্তরের দশকে বাঁধের যে প্রস্থচ্ছেদ ছিল, তা এখন বহুলাংশে ক্ষqcvß nয়েছে। বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব চিংড়ি ঘের মালিকদের নেয়া উচিত। তারা নোনা পানি আনার জন্যও বাঁধ ফুটো না করে ওপর দিয়েও আনতে পারেন।

শেখ রোকন: সিডরের সময় উপকূলীয় বাঁধ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছি। কিন্তু দুই বছরেও সেটা মেরামত করা হয়নি। এজন্য পর্যvß বরাদ্দ নেই বলে বলা হচ্ছে। আসলে সমস্যা কোথায়?
আইনুন নিশাত: সিডরের সময় কিন্তু সাউথখালির মতো নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে বাঁধ পুরোপুরি ভেঙেছিল। কিন্তু ক্ষwZM¯ হয়েছিল অনেক জায়গায়। ওই দুর্বল জায়গাগুলো এবার একেবারে ভেঙে গেছে। প্রশ্ন nচ্ছে, বাঁধ মেরামতের দায়িত্ব কারা নেবে? একশ বছর আগে স্থানীয় জনসাধারণ যেভাবে এগিয়ে আসতো, সে ব্যবস্থাপনা ফিরিয়ে আনতে হবে। যেসব স্থানে বাঁধ m¤úY wea¨¯ হয়েছে, সেখানে অবশ্য সরকারি অর্থায়ন প্রয়োজন; কিন্তু সে কাজেও জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। বরাদ্দের যা হচ্ছে, সেটা দুঃখজনক। সিডরের সময় বাঁধের যে ক্ষতি হয়েছিল, সেটা cরণের জন্য ২০-৩০ কোটি টাকা দরকার ছিল। কিন্তু আইলায় যে ক্ষতি হয়ে গিয়েছে, তাতে এখন এক দেড়শ কোটি টাকার কমে হবে না। নীতিনির্ধারকরা বাঁধ মেরামতের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন না করার কারণেই আমাদের এখন এতটা বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে।
শেখ রোকন: এবার কয়েকটি স্থানে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে বাঁধ মেরামতের চেষ্টা দেখা গেছে। সেটা কতখানি কার্যকর হতে পারে?
আইনুন নিশাত: সংবাদমাধ্যমে দেখছি, ইতিমধ্যে কোন কোন স্থানে ক্ষwZM¯ জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করেছে। এটা খুবই

উৎসাহব্যঞ্জক। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরাও বলছেন, লাইনে বসিয়ে ত্রাণ দেয়ার বদলে শ্রমের বিনিময়ে যদি দেয়া যেত, তাহলে বাঁধগুলো অনেকাংশে মেরামত সম্ভব হতো। যারা দুর্বল, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী তারাই কেবল বিনা কাজে ত্রাণ পেতে পারে। কাজের বিনিময়ে ত্রাণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা গেলে আমাদের কিন্তু বিশ্বব্যাংকের দুয়ারে হাত পাততে হয় না।

শেখ রোকন: বাঁধ সংস্কার নিয়ে সম্ভবত বিশ্বব্যাংকের একটি প্রকল্প ছিল। সেটার কী অবস্থা?

আইনুন নিশাত: আমাদের জানা দরকার, বিশ্বব্যাংক একটি অর্থলগ্নীকারক প্রতিষ্ঠান। ঋণ দিয়ে সুদ আদায় করে থাকে। ঋণ চাইলেই ঋণ দেয় না। সরকারকে প্রকল্প হাতে নিতে হয়, সেটা পছন্দ হলেই কেবল ঋণ দিতে আগ্রহী হয়। পছন্দ করার আগে তারা নিজেদের মতো করে সমীক্ষা চালায়। তখন তারা নানা প্রশ্নও তোলে, সদুত্তর পেলেই কেবল অর্থায়নে সম্মত হয়।

শেখ রোকন: দাতা সংস্থার সাহায্য বা ঋণের জন্য হাত গুটিয়ে বসে থাকা কি ঠিক হবে?

আইনুন নিশাত: খবরের কাগজে দেখছি, ত্রাণ কাজের জন্য সরকার নিজেদের সম্পদ ব্যবহারে আগ্রহী। এটা সঠিক wm×vš— বলে আমি মনে করি। Nর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র বা বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে অবশ্য সেটা সম্ভব নয়। ওসব কাজে যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকু ঋণ নেয়া যেতে পারে। এসব প্রকল্পের বিদেশী প্রযুক্তি বা প্রযুক্তিবিদ নেয়ার দরকার নেই। উপযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশেই আছে। অভাব রয়েছে কেবল উপযুক্ত তদারকি ব্যবস্থা বা মান wbqšণের। আমার জানামতে, সরকার ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলোর কাছে ঋণ চেয়েছে। তথাকথিত দাতাদের তেমন তৎপরতা এখনও দেখছি না।

শেখ রোকন: কোথাও কোথাও তো দুর্গতরা পানি উন্নয়ন বোর্ডের বদলে বাঁধ সংস্কারে সেনাবাহিনীকে সম্পৃক্ত করার দাবি তুলেছে।

আইনুন নিশাত: সেনাবাহিনীকে সম্পৃক্ত করার দাবির পেছনের ধারণা বোধকরি এমন– তাদের দ্বারা নির্মিত বাঁধ ডিজাইন অনুযায়ী ও মজবুত হবে। এতে করে পাউবোর কাজে অনাস্থাই প্রকাশ পেয়েছে। পাউবো বা সেনাবাহিনী, কাজ যারাই করুক অর্থায়ন করবে সরকার। আমরা সরকারের কাছে চাইব, বাঁধের মান যেন wbqwšZ হয়।

শেখ রোকন: কেউ কেউ বলছেন, উপকূলীয় বাঁধের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা দরকার। আপনার পরামর্শ কি?

আইনুন নিশাত: কেউ কেউ টাস্কফোর্সের কথা বলছেন বটে। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থী থাকাকালে ম্যানেজমেন্টের শিক্ষক বলেছিলেন, কোন সমস্যার সমাধান জটিল মনে হলে ভালো উপায় হচ্ছে ষের বোধগম্য করতে হবে। শহরকেন্দ্রীক ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থার পরিবতর্তে স্থানীয় বন্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। এজন্য চাই শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। বাঁধের কার্যকারিতা বজায় রাখার নিশ্চয়তা তাদের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। এখন থেকেই সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের mPv i¯ কার্যক্রম গড়ে তুলতে হবে।
আমি মনে করি, বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট ভালো। আমাদের ÷vন্ডিং অর্ডার অন ডিজা÷ার বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। প্রয়োজন AvgjvZwšক বেড়াজাল থেকে বের হওয়া। প্রশাসনের প্রত্যেক ¯‡i দায়িত্ব পর্যালোচনা করা।

দৈনিক সমকাল
১৩ জুন, ২০১১

ড. সলীমুল হক
জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত নিয়োগ করা দরকার

ড. সলীমুল হক ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে লন্ডনভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্রুপে কাজ করছেন। জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বিশ্বব্যাংক ও এডিবির অন্যতম উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করছেন ড. হক। তিনি আইপিসিসির তৃতীয় প্রতিবেদনের এডাপটেশন অধ্যায়েরও শীর্ষস্থানীয় প্রণেতা। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন দেশ ও দাতা সংস্থাকেও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০০৭ সালে 'বারটোনি অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন।
ড. সলীমুল হক বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজের (বিসিএএস) প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক। তিনি বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। ড. হক ১৯৭৫ সালে লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজ থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় সম্মানসহ বিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। বিসিএএস প্রতিষ্ঠার আগে কয়েক বছর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার ক্ষেত্রে আমরা দুটি টার্ম বেশি শুনে থাকি– মিটিগেশন ও অ্যাডাপটেশন। আপনি নিজেও অ্যাডাপটেশন বিশেষজ্ঞ। এ দুটি বিষয় আসলে কী, পাঠকদের জন্য সহজ ও সংক্ষেপ করে বলবেন কি?
সলীমুল হক : কেবল বাংলাদেশের জন্য নয়, জলবায়ু পরিবর্তন গোটা বিশ্বের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা। এ সম্পর্কিত কিছু টার্মিনলজি আমাদের সবারই জানা উচিত। আপনি ঠিকই বলেছেন, এ সমস্যা মোকাবেলায় দুটি টার্ম বহুল ব্যবহৃত। মিটিগেশন হচ্ছে গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর পদ্ধতি। কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন জ্বালানি পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন প্রভৃতি গ্যাস হচ্ছে গ্রিনহাউস গ্যাস। এগুলো বায়ুমণ্ডলে গিয়ে পৃথিবী উত্তপ্ত করে তোলে। মিটিগেশন সব দেশেই প্রয়োজন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যের মতো উন্নত দেশ এবং চীন ও ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেশি প্রয়োজন। বাংলাদেশে গ্রিনহাউস গ্যাস উদ্‌গিরণ খুবই কম। আমরা কেবল উন্নত বিশ্বকে এ ব্যাপারে চাপ দিতে পারি। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক একটি চুক্তি আছে। সেটাকে বলা হয় ইউএন কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ। এ চুক্তি বাস্তবায়নে আমরা কণ্ঠ জোরদার করতে পারি।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে অ্যাডাপটেশন। জলবায়ুতে ইতিমধ্যে যে পরিবর্তন হয়ে গেছে, সেটার ক্ষতি আমরা আগামী ২০ বছরের জন্য ঠেকাতে পারব না। গ্রিনহাউস গ্যাস উদ্‌গিরণ যদি শূন্যতেও নিয়ে আসি, আগামী ২০ বছরে যে তাপমাত্রা বাড়বে, সেটা ঠেকাতে পারব না। আগামী ২০ বছরে যে দুর্যোগ হবে, সেগুলো এড়ানো যাবে না। এর ক্ষতিকর দিক কমিয়ে আনার যে প্রস্তুতি, সেটা হচ্ছে অ্যাডাপটেশন। এ অ্যাডাপটেশনই বাংলাদেশের জন্য জরুরি। এ সম্পর্কে সবার সচেতনতা দরকার।

শেখ রোকন: অ্যাডাপটেশন একটি দীর্ঘমেয়াদি ও সর্বব্যাপী প্রক্রিয়া। মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের আগে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। বাংলাদেশ সেদিক থেকে কোন পর্যায়ে রয়েছে?
সলীমুল হক : আমি তো বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে আফ্রিকা ও এশিয়ার লিস্টডেভেলপড দেশগুলো নিয়ে কাজ করে থাকি। তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশ অন্যদের চেয়ে এগিয়ে আছে। ইতিমধ্যে ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন বা নাপা তৈরি করেছে। ৪০টি এলডিসিভুক্ত দেশের অন্যরাও এটা করেছে; কিন্তু বাংলাদেশ করেছে সবার আগে। এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজিও করেছে। এটা কিন্তু অন্যরা এখনও করতে পারেনি। তারা বাংলাদেশের কাছে শিখতে চাচ্ছে।
সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে আমরা অন্যদের তুলনায় কেবল এগিয়ে নয়, প্রশিক্ষণ দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছি। বিশেষ করে, আফ্রিকান দেশগুলো থেকে আমাদের দেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা বিষয়ে শিখতে আসতে পারে। বস্তুত আগামী বছর থেকে বাংলাদেশে ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেন্টার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছি আমি। আমার বর্তমান কর্মক্ষেত্র আইআইইডি (ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) এখানকার বিসিএস এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে এটি প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে। এখানে স্বল্পমেয়াদি কোর্স চালু করব। প্রথম কোর্সটি এ বছর নভেম্বরে শুরু হচ্ছে। আগামী বছর থেকে নিয়মিত কয়েক মাস পরপর চলবে। এতে বাংলাদেশের লোকও থাকবে; কিন্তু মূলত বিদেশিদের জন্য। আমরা আশা করছি, পরের বছর থেকে ফুল মাস্টার্স কোর্স চালু করতে পারব। পিএইচডি ডিগ্রি হয়তো আমরা দিতে পারব না; ওই পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা আমাদের সঙ্গে কাজ করতে পারবে।

শেখ রোকন: আপনি বলছিলেন, আগামী বছর থেকে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর একটি মাস্টার্স কোর্স চালুর প্রক্রিয়া চলছে। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় বিষয়টি নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা চলছে কি-না?
সলীমুল হক : আমি মনে করি, এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের মতো দেশে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ পর্যায়ে হোক, এমনকি মাধ্যমিক বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হোক জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জানাতেই হবে। ভবিষ্যতে তাদের

তো বিষয়টি মোকাবেলা করতেই হবে। এটা নিয়ে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। পরিবর্তিত জলবায়ুতে কীভাবে চলতে হবে, সেটা তাদের জানা দরকার। এ বিষয়ে জনসচেতনতাও জরুরি।

শেখ রোকন: সরকারি পর্যায়ে যে নাপা ও ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি করা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রস্তুতির জন্য সেটা কতটা যথেষ্ট?
সলীমুল হক : আমি মনে করি, প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এটা খুবই ভালো। কারণ এটা না করলে আর কিছু করা যাবে না। কিন্তু এটা নিয়ে আত্মতুষ্ট হয়ে বসেও থাকা উচিত হবে না। এটা একটা পরিকল্পনা। অতীতে আমরা বাংলাদেশেও দেখেছি, পরিকল্পনা করা সহজ, বাস্তবায়ন করা কঠিন। এখন এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করাটা বড় চ্যালেঞ্জ। অবশ্য সেক্ষেত্রেও আমি মনে করি না যে, আমরা পিছিয়ে রয়েছি। সরকার ইতিমধ্যেই নিজেদের অর্থে সাতশ' কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। বাইরের পক্ষগুলোও অর্থায়নের জন্য প্রস্তুত। তারা মাল্টিডোনার ট্রাস্ট ফান্ড করতে চাচ্ছে।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল কীভাবে ব্যবস্থাপনা হবে, সেটা নিয়ে বোধহয় এক ধরনের জটিলতা তৈরি হয়েছে...
সলীমুল হক : ট্রাস্ট ফান্ডের গভর্ন্যান্স, ম্যানেজমেন্ট পরিচালনা নিয়ে কিছু দ্বিমত রয়েছে। আমরা আশা করি, সেটা মিটে যাবে। একটা অ্যাকশন প্ল্যান হবে। বছর খানেকের মধ্যে আশা করি আমরা বাস্তবায়ন পর্যায়ে চলে যেতে পারব। আগেই যেমনটি বলেছি, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে আছে, এমনকি উন্নত দেশগুলোর চেয়েও। উন্নত দেশগুলো এতদিন ভেবেছিল, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে তাদের বোধহয় চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আইপিসিসির চতুর্থ প্রতিবেদনের পর তারা বুঝতে পেরেছে, তাদেরও রক্ষা নেই। ইতিমধ্যে ইউকে, ফ্রান্স, জার্মানি নিজেদের অ্যাডাপটেশন প্রোগ্রাম শুরু করেছে। কয়েক মাস আগে যুক্তরাষ্ট্রও শুরু করেছে। মাস দুয়েক আগে তারা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল এটা জানতে যে, আমরা নাপা কীভাবে করেছি। তারা আমাদের কাছে শিখতে চাচ্ছে।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা নিয়ে আমাদের দেশে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে গবেষণা কতটা হয়েছে?
সলীমুল হক : গবেষণা ও খুব একটা খারাপ হয়নি বলে আমি মনে করি। বিসিএসে যেসব গবেষণা হয়েছে, তার ভিত্তিতেই কিন্তু আমি আন্তর্জাতিকভাবে কাজ শুরু করেছি। ইতিমধ্যে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কিন্তু প্রচুর গবেষণা হয়েছে। এখন বোধহয় কিছু গুণগত উন্নয়নের দরকার আছে। আমরা এখনও অনেকটা বৈজ্ঞানিক তথ্যবিহীন কথা বলছি। তথ্য না থাকলে তত্ত্বভিত্তিক কথা বলা

কঠিন। কথা বলা বা পত্রিকায় আর্টিকেল লেখা সহজ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করতে যে তথ্য দরকার, সেটা সংগ্রহ করা কঠিন। তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণার মানোন্নয়নের দিকে আমাদের এখন জোর দিতে হবে। সাধারণভাবে জানা কিছু কথার ভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয়ে পরিকল্পনা করা যায় না। বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের তথ্য আমাদের হাতে থাকতে হবে।

শেখ রোকন: বলা হচ্ছে, কৃষির ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক প্রভাব পড়বে। এক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি?
সলীমুল হক : কৃষির ক্ষেত্রে অন্তত তিন ধরনের প্রভাব পড়বে। একটি হচ্ছে, উপকূলীয় অঞ্চলে নোনাপানি অনুপ্রবেশ। আমাদের এখন ফসলের এমন জাত প্রচলন করতে হবে, যেগুলো নোনাপানিসহিষ্ণু।

শেখ রোকন: সীমিত পর্যায়ে নোনাপানিসহিষ্ণু জাতের একটি ধান বোধহয় ইতিমধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলে আবাদ করা হয়েছে।
সলীমুল হক : ব্রি থেকে বিআর-৪৭ একটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। আমি কিছুদিন আগে উপকূলীয় অঞ্চলে সেটা দেখে এসেছি। ভালোই চলছে। এমন আরও কিছু জাত আমাদের প্রয়োজন হবে। দ্বিতীয়ত খরাপ্রধান, বিশেষত বরেন্দ্র অঞ্চলের জন্য খরাসহিষ্ণু ফসল দরকার হবে। কম পানি ব্যবহার করে যে কৃষিকাজ করা যায়, সেদিকে নজর দিতে হবে। তৃতীয়ত প্লাবন এলাকা। আগামীতে ওই এলাকায় প্লাবন আরও বেড়ে যাবে। বন্যার সঙ্গে মিলে টিকে থাকে এমন ফসল প্রয়োজন হবে। এমন কিছু পুরনো জাতের আমন আমাদের আছে, সেগুলোকে উচ্চ ফলনশীল করতে হবে। আমি মনে করি, আমাদের দেশীয় কৃষি বিজ্ঞানীরা এটা পারবেন। কিন্তু এখন থেকে লেগে থাকতে হবে। গবেষণা ট্রায়াল এখন থেকে শুরু করতে হবে।

শেখ রোকন: উপকূলীয় অঞ্চলে যে ধরনের দুর্যোগ হয়, সেগুলো মোকাবেলায় বাংলাদেশের দক্ষতা প্রশংসনীয়। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ওইসব দুর্যোগ আরও অনেক বেড়ে যাবে। তাতে করে বর্তমান অবকাঠামো কি যথেষ্ট? কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন আছে কি-না?
সলীমুল হক : বিজ্ঞানীরা বলছেন, তা হলো তীব্র আকারের হাই ইনটেনসিটি ঘূর্ণিঝড় বাড়বে। কারণ ইনটেনসিটি নির্ভর করে পানির তাপমাত্রার ওপর। বিশেষ করে, টাইডাল বোর থাকলে ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেড়ে যাবে। সেটাও কিন্তু তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। সুতরাং জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতাও বেড়ে যাবে। আমাদের ঘূর্ণিঝড় সতর্কতা ব্যবস্থা কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত। ঘূর্ণিঝড়

আশ্রয় কেন্দ্রও আছে। অর্থাৎ সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মানুষের প্রাণ বাঁচানোর যথেষ্ট ভালো ব্যবস্থা আমাদের আছে।

শেখ রোকন: আশ্রয় কেন্দ্র কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম?

সলীমুল হক : অবশ্যই কম। এটা আরও বাড়াতে হবে। কিন্তু আপনি দেখবেন, আগের তুলনায় আমাদের প্রাণহানি অনেক কমেছে। '৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে যত লোক মারা গেছে, সিডরের সময় সে তুলনায় অনেক কম। আবার একই সময়ে নার্গিসে কিন্তু মিয়ানমারে অনেক বেশি প্রাণহানি ঘটেছে। আইলার সময়ও আমাদের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তার মানে, আমরা উপকূলীয় দুর্যোগ মোকাবেলায় অন্যদের চেয়ে এগিয়ে আছি।

শেখ রোকন: উপকূলীয় বাঁধও এক্ষেত্রে একটি বড় বিবেচনার বিষয়?

সলীমুল হক : বাঁধ নিয়ে আমাদের চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। নদীতে এবং উপকূলে যে বাঁধ আমরা করেছি, সেটা আমাদের কতটা কাজে এসেছে, এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। আমাদের মতে, এখন যেখানে যেখানে বাঁধ আছে, সেগুলো আরও শক্তিশালী করা এবং উচ্চতা বাড়ানো দরকার। বাঁধের পেছনে জনবসতি ও কৃষিভূমিকে সুরক্ষা দিতে হবে। ভবিষ্যতে নতুন বাঁধ দেওয়া কতটা প্রয়োজন, সেটা আমার মনে হয় আরও ভাবা দরকার। সব জায়গায় বাঁধ উপকারে আসে না। অনেক ক্ষেত্রে বাঁধ অপকারী হয়।

শেখ রোকন: উপকূলীয় অঞ্চলের জনবসতি নিয়েও তো চিন্তা-ভাবনা দরকার?

সলীমুল হক : প্লাবিত এলাকায় বাড়িঘর উঁচু করা দরকার, যাতে নিচতলা প্লাবিত হলে কোনো ক্ষতি না হয়। উপকূলীয় অঞ্চলে ঘরবাড়ি এমনভাবে তৈরি করা দরকার, যাতে দেড়-দুইশ' কিলোমিটার বেগের বাতাস থেকে সেগুলো রক্ষা পায়।

শেখ রোকন: ভাতে-মাছে বাঙালির মৎস্যখাত এমনিতেই বিপন্ন। জলবায়ু পরিবর্তন নতুন কোনো বিপদ আনবে কি? সেক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি?

সলীমুল হক : মৎস্যখাতে কী প্রভাব পড়বে, সেটা বলা কঠিন। এটা বলা যায়, উপকূলীয় অঞ্চলে মিঠাপানির মাছ থাকবে না। লোনাপানির মাছই কেবল থাকবে। তবে এ নিয়ে আরও গবেষণার দরকার আছে।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নদীভাঙন বাড়তে পারে বলে বলা হচ্ছে। হিমালয়ের হিমবাহ বেশি হারে গলার ফলে বাড়বে নদীবাহিত বন্যাও। এক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি?

সলীমুল হক : কিছু অংশে নদীভাঙন বাড়ার আশঙ্কা তো আছে। এটাকে মোকাবেলার দুটি উপায় হতে পারে। যেসব এলাকায় ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট আছে– ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, স্কুল, সেতু, শহর আছে– সেগুলোকে বাঁধ দিয়ে রক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু কৃষি এলাকায় বাঁধ দিয়ে ফসল রক্ষা করার ক্ষমতা-অর্থ আমাদের নেই। কতটা ব্যয়সাশ্রয়ী, সেটা নিয়েও দ্বিধা আছে। আমাদের পলল মাটির নদী চিরকালই ভেঙে আসছে। ভাঙবেই। কিছু ভাঙন মেনে নিয়েই চলতে হবে।

শেখ রোকন: আইপিসিসির চতুর্থ প্রতিবেদনে তো বলা হচ্ছে, ৫০ বছরের মধ্যে সুন্দরবন নাও থাকতে পারে। এক্ষেত্রে কী করণীয়?

সলীমুল হক : সুন্দরবন নিয়ে আমরা অত্যন্ত চিন্তিত। কারণ সুন্দরবনে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। একটা হচ্ছে, সমুদ্রতল যদি বাড়তে থাকে লোনাপানি বনে ঢুকতে থাকবে। অবশ্য সুন্দরবনের কিছু উদ্ভিদ, যেমন সুন্দরী, লোনাপানিতে টিকে থাকে। কিছু কিছু উদ্ভিদ পারে না। লবণাক্ততা বেড়ে গেলে সেগুলো টিকবে না। জনবসতি না থাকলে হয়তো সুন্দরবন ভেতরের দিকে চলে আসত। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়।

সুন্দরবন রক্ষার জন্য বন গবেষকরা ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছেন বলে আমি জানি। সেটা হচ্ছে, লোনাসহিষ্ণু জাত চিহ্নিত করতে পারি। সেগুলোর বীজ সংগ্রহ ও উৎপাদন করে আমরা বুনে দিতে পারি। এভাবে ন্যাচারাল সাকশেন, যেটা ৫০-৬০ বছর লাগে, ত্বরান্বিত করতে পারি। ১০-২০ বছর আগের গাছ মরে গেলেও নতুন গাছ গজিয়ে উঠবে। কিছু প্রজাতির পরিবর্তন হয়ে যাবে; কিন্তু বনটা রক্ষা পাবে।

শেখ রোকন: সবচেয়ে কঠিন হবে বোধহয় উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা। আমরা সবকিছুর বিকল্প হয়তো পাব, পানি পাব কীভাবে?

সলীমুল হক : সুপেয় পানি একটি বিরাট সমস্যা আকারে দেখা দেবে। এখনই উপকূলের বিভিন্ন অঞ্চলে মিঠা পানির সংকট দেখা দিয়েছে। কোথাও কোথাও বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করার চেষ্টা চলছে। সামনের দিনগুলোতে সেটা আরও ব্যাপক হবে। দীর্ঘমেয়াদে, ২০-৩০ বছর পর, হয়তো উপকূলের কোনো কোনো অংশ থেকে আমাদের লোকজন সরানোর চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। বিষয়টি নিয়ে এখন থেকেই চিন্তা-ভাবনা শুরু করতে হবে। পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন হয়তো পরে হবে।

শেখ রোকন: শুধু সুপেয় পানির কারণেই লোকজনকে সরিয়ে আনতে হবে?

সলীমুল হক : শুধু পানির কারণে নয়। অনেক স্থানে তো ভূমিও তলিয়ে যাবে। সমুদ্রপৃষ্ঠ যে আকারে বাড়বে বলা হচ্ছে, সেটা হলে তো অনেকখানি ভূমিও চলে যাবে। সেটা ১০-২০ বছরে হবে না হয়তো, ৫০-৬০ বছরে হবে। আর লবণাক্ত পানির ক্ষেত্রে বৃষ্টির পানি ছাড়া তেমন কোনো বিকল্প নেই। একটা হতে পারে, বাইরে থেকে পানি টেনে আনা। যেমন খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলে ৫০ কিলোমিটার দূরে ট্যাঙ্কার পাঠিয়ে ফ্রেশ ওয়াটার এনে বয়লার চালিয়ে থাকে। কিন্তু লাখ লাখ লোকের খাবার পানির ক্ষেত্রে সেটা কতটা সম্ভব বলা যাচ্ছে না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো সেটাও করতে হতে পারে। লবণাক্ত পানি বিশুদ্ধকরণের কথাও চিন্তা করা যেতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যে যেমন করা হয়। তবে অত্যন্ত হাইটেক ও ব্যয়বহুল ব্যাপার।

শেখ রোকন: সুপেয় পানির বিষয়টি শুনেই মনে হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার বিষয়টি বিরাট খরচের ব্যাপার। এ ব্যাপারে কোনো হিসাব কি করা গেছে যে, এজন্য বাংলাদেশের কত টাকার প্রয়োজন হবে?
সলীমুল হক : কত টাকা লাগবে আমি ঠিক বলতে পারছি না। তবে কেউ কেউ বলছেন, এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তিন থেকে চার বিলিয়ন ডলার খরচ হতে পারে। ফিগারটি আমি ড. আইনুন নিশাতের কাছ থেকে শুনেছি। তিনি হয়তো ভালো বলতে পারবেন। অবশ্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খরচের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা চলছে। বলা হয়, সাধারণভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রতি বছর ১০ থেকে ৫০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হতে পারে। কোন দেশে কত টাকা লাগবে, সেটা এখনও নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না।

শেখ রোকন: টাকাটা আসবে কোথা থেকে?
সলীমুল হক: এ টাকাটা উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে আদায়ের জন্য ইউএন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জে আলোচনা চলছে। বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলো দাবি করছে, টাকাটা অতিরিক্ত অনুদান হিসেবে আসতে হবে।

শেখ রোকন: রেগুলার এইডের বাইরে?
সলীমুল হক: হ্যাঁ, রেগুলার এইডের বাইরে। ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের আওতায় আলাদাভাবে। ঋণ হিসেবে নয়, অনুদান হিসেবে। এটা নিয়মিত, প্রত্যেক বছর আসতে হবে। কোপেনহেগেনে এটা চূড়ান্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ওই সম্মেলনের পরে আমরা বুঝতে পারব, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক উদ্যোগ থেকে কী পরিমাণ অর্থ পেতে পারে।

শেখ রোকন: আন্তর্জাতিক উদ্যোগের বাইরে বাংলাদেশ সরাসরি কোনো অর্থ পেতে পারে কি-না? ব্রিটেনের সঙ্গে এমন একটি ব্যবস্থার কথা আমরা শুনেছিলাম।
সলীমুল হক: বাংলাদেশ সেটা পেতেই পারে। কারণ প্রস্তুতির দিক থেকে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে আছে– নাপা করেছে, স্ট্র্যাটেজি করেছে, নিজেদের অর্থায়নে তহবিল তৈরি করেছে। এগুলো দেখে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশই এগিয়ে আসছে। ব্রিটেন ইতিমধ্যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে, ডেনমার্ক, জাপানও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে আমরা শুনেছি। এটা জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্কের বাইরে। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে বাংলাদেশ হয়তো কয়েক হাজার কোটি টাকা সরাসরি পাবে।
শেখ রোকন: এখন পর্যন্ত তো কোনো টাকা আমরা হাতে পাইনি?
সলীমুল হক: এখনও পাইনি। কারণ তহবিলটা কীভাবে ব্যবস্থাপনা হবে, সেটা নিয়ে মতভেদ এখনও কাটিয়ে ওঠা যায়নি। দাতারা চাচ্ছে, সেটা বিশ্বব্যাংকের তত্ত্বাবধানে হোক, বেসরকারি সংগঠনগুলো একদমই বিশ্বব্যাংকের বিরুদ্ধে। আমি মনে করি, শুরুতে কিছুদিনের জন্য, দু'এক বছরের জন্য বিশ্বব্যাংককে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে, যাতে দাতারা অর্থায়নের আস্থা পায়। পরে আস্তে আস্তে সরকার দায়িত্ব নেবে।

শেখ রোকন: আমরা শেষ পর্যায়ে এসেছি। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে ঠিক এ মুহূর্তে বাংলাদেশের কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?
সলীমুল হক: জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে এ বছরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমরা জানি, ডিসেম্বরে কোপেনহেগেনে বড় একটা সম্মেলন হচ্ছে। ডিসেম্বরের আগে বাংলাদেশের জন্য আরও চারটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হতে যাচ্ছে। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে জার্মানির বনে, সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে ব্যাংককে, নভেম্বরে স্পেনের বার্সেলোনায় বৈঠক হবে। আবার সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনও আছে। সুতরাং এ বছর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জলবায়ু ইস্যুতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। এসব সিদ্ধান্তে বাংলাদেশকে সক্রিয় অংশ নিতে হবে। আমরা এ ধরনের বৈঠকে অংশ নিই, কিন্তু যতটা গুরুত্ব দিয়ে অংশ নেওয়া প্রয়োজন, সেটা আমরা পারি না। অন্তত সরকারি পর্যায়ে। বেসরকারি পর্যায়ে আমরা যাই; কিন্তু নেগোশিয়েশনটা তো সরকারি পর্যায়েই হতে হবে। সরকারি পর্যায়ে যে ভালো লোক যান না, সেটা নয়। কিন্তু আমরা ফোকাসটা পাই না।
আমি আগেও বলেছি, আমাদের উচিত হচ্ছে খুব শিগগিরই উচ্চ পর্যায়ের একজন জলবায়ু সংক্রান্ত দূত নিয়োগ করা। ভারত, জাপান, যুক্তরাজ্য ইতিমধ্যে এটা করেছে। তার কাজই হবে জলবায়ু সংক্রান্ত নেগোশিয়েশন করা। কারণ এটা ফুলটাইম কাজ। মন্ত্রণালয়ের সচিবের আরও অনেক কাজ থাকে। তিনি হয়তো এক সপ্তাহের জন্য একটি বৈঠকে যান, ফিরে এসে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেটাই স্বাভাবিক। এজন্য একজন ডেডিকেটেড পারসন দরকার। তিনি জাতিসংঘ

বা জেনেভায় নিযুক্ত সাবেক বা বর্তমান দূত হতে পারেন। অবসরপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব বা রাষ্ট্রদূতও এ দায়িত্ব পেতে পারেন। কারণ তার কূটনৈতিক দক্ষতা থাকতে হবে। কারণ আন্তর্জাতিক নেগোশিয়েশনের ক্ষেত্রে কারিগরি দক্ষতা ততটা জরুরি নয়। তাকে কারিগরি সহায়তা দেওয়ার অনেক লোক পাওয়া যাবে। তাকে জানতে হবে কীভাবে নেগোশিয়েশন করতে হবে, কীভাবে বাংলাদেশের স্বার্থ আদায় হবে। কারণ এটা স্থায়ী ইস্যু।

দৈনিক সমকাল
৩ আগস্ট, ২০০৯

শাইখ সিরাজ
কৃষককে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে

কৃষি উন্নয়ন ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ ১৯৯৯ সাল থেকে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আই-এর পরিচালক ও বার্তা প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। তার আগে ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাংলাদেশ টেলিভিশনে কৃষিভিত্তিক প্রামাণ্য অনুষ্ঠান 'মাটি ও মানুষ' উপস্থাপনা করে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। পরবর্তীকালে পরিচালিত কৃষি বিষয়ক প্রমাণ্য অনুষ্ঠান চ্যানেল আই'র 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ' ও 'কৃষি দিবানিশি' এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'মাটি ও মানুষের ডাক' এবং সংবাদপত্রে লেখা কৃষি বিষয়ক কলামও দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। কৃষিকে উন্নয়ন ও সাংবাদিকতার মূল ধারায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে শাইখ সিরাজের গত তিন দশকের প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ১৯৯৫ সালে সর্বচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক এবং প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা থেকে ২০০৯ সালে এএইচ বোয়েরমা পুরস্কারসহ দেশী-বিদেশী উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পুরস্কার লাভ করেন। শাইখ সিরাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগ থেকে ১৯৮০ সালে স্নাতক ও ১৯৮২ সালে স্নাতোকত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তার জন্ম ১৯৫৪ সালে চাঁদপুরে।

শেখ রোকন: আপনি তো তিন দশক ধরে কৃষি সাংবাদিকতা করছেন। বলা চলে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের জন্য একটি নতুন ক্ষেত্র তৈরি করেছেন। এ সময়ের মধ্যে কৃষিতে ঠিক কী ধরনের পরিবর্তন আপনার চোখে ধরা পড়েছে? মোটাদাগে যদি বলেন।

শাইখ সিরাজ: খুব সংক্ষেপে বলা যায়, আগে কৃষির প্রতি নাগরিকদের কোনো দৃষ্টি ছিল না, নীতিনির্ধারকদের মনোযোগ ছিল না। তিন দশক পরে দেখা যাচ্ছে শহরের মানুষও কৃষি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে। নীতিনির্ধারকরাও কৃষি নিয়ে কথাবার্তা বলছেন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের তাগিদ অনুভব করছেন। আগে আমরা কৃষকদের চাষা বলে গালি দিতাম; এখন তাদের খানিকটা মর্যাদার চোখে দেখা হয়। একটি বিশাল সাফল্য এসেছে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। একাত্তর সালে জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি, এখন দাঁড়িয়েছে পনের কোটিতে অর্থাৎ দ্বিগুণ। কৃষকই তাদের ভরণ-পোষণ করছে।

অন্য একটি দিক হচ্ছে, কৃষির ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে। আগে শাকসবজির জন্য আমাদের শীতের অপেক্ষায় থাকতে হতো। এখন বছরব্যাপী পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য কৃষির উন্নয়ন হলেও কৃষকের উন্নতি একেবারে হয়নি। কেউ কেউ আরও দরিদ্র হয়েছে। গ্রামের মানুষ আগে কেবল ধান ও পাট– দুটি ফসলের চাষেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন ফসলে বৈচিত্র্য এসেছে।

কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। আলু, টমেটো, বাউকুল, স্ট্রবেরির মতো ফসলের চাষাবাদ বেড়েছে, মাছ চাষ বেড়েছে। হতে পারে আমার কাজের কারণে কৃষির প্রতি মানুষের দৃষ্টি এসেছে। অনেক বেকার তরুণ ও গৃহবধূ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কৃষক আগের চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহ নিয়ে কৃষিকাজ করছে।

শেখ রোকন: কৃষকের এ আগ্রহ বোধহয় একান্তই নিজের। কিছু বেসরকারি পক্ষ উৎসাহ দিচ্ছে। সরকারের কী অবদান?

শাইখ সিরাজ: হ্যাঁ, কৃষক নিজে নিজে করছে, নিজের তাগিদেই করছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ না থাকার কারণে আমাদের কৃষিতে নিরাপত্তাহীনতাও তৈরি হচ্ছে। ধানের ভালো দাম না পেলে কৃষক অন্যান্য ফসল চাষাবাদের দিকে চলে যেতে পারে। প্রধান ফসল আবাদ কমে গেলে দেশ খাদ্য ঘাটতিতে পড়তে পারে। রাষ্ট্রের উচিত হবে ধানের মূল্য নিশ্চিত করা। কৃষক যেন ধান ফলিয়ে উৎপাদন খরচের চেয়ে বেশি দাম পায়। কৃষকের যেন লাভ হয়। এ ব্যাপারেও সাম্প্রতিক সময়ে নীতিনির্ধারকরা আগের চেয়ে সজাগ হয়েছেন বলে আমি মনে করি।

শেখ রোকন: বছর দুয়েক আগে দৈনিক যুগান্তরের পক্ষে আমি আপনার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সেখানে আপনি বলেছিলেন, স্বাধীনতার পর থেকে কোনো সরকারই কৃষির প্রতি যথার্থ মনোযোগ দেয়নি। এই যে নজর না দেওয়া– বিষয়টি কি অদক্ষতা, না অবহেলা?

শাইখ সিরাজ: অবহেলা, একেবারে অবহেলা। আরও বড় বিষয় হচ্ছে, কেবল যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই এমন হয়েছে, তা নয়। এশিয়ার অনেকে দেশেই রাষ্ট্র কৃষিতে খুব একটা নজর দেয়নি, কৃষিতে বিনিয়োগ করেনি। যে কারণে এখন কিন্তু কৃষি একটি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে। এখনকার আরেকটি বাস্তবতা হচ্ছে, নিজেদের খাদ্য নিজেদেরই উৎপাদন করতে হবে। বিশ্বে কেউ আর অন্যকে খাদ্য সরবরাহের অবস্থায় নেই। পকেটভর্তি পয়সা থাকলেও খাদ্য কিনতে পাওয়া যায় না।

শেখ রোকন: ধান ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন নিঃসন্দেহে বেড়েছে, অনেক ক্ষেত্রে দ্বিগুণ। তারপরও প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে খাদ্য আমদানি করতে হয় কেন?

শাইখ সিরাজ: খুব বেশি আমদানি করতে হয় না। মূলত গম আমদানি করতে হয়। আমাদের ধান হয় কমবেশি পৌনে তিন কোটি থেকে দুই কোটি আশি টন।

আমাদের তার চেয়ে পাঁচ-দশ টন বেশি প্রয়োজন হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি হলে তখন হয়তো ১০/১২ লাখ টন বেশি প্রয়োজন হয়। আমাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে খাদ্য সঞ্চয়ের সামর্থ্য (স্টোরেজ ক্যাপাসিটি) কম থাকা। আমরা কিন্তু ১২ লাখ টনের বেশি সংরক্ষণ করতে পারি না। যে কারণে আমাদের ফসল নানাভাবে নষ্ট হয়, অপচয় হয়। একটি ফসল ভালো না হলে তখন বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। বর্তমান সরকার এ বিষয়টি আমলে নিয়ে আমাদের স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ১৮ লাখ টনে বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। দাতাগোষ্ঠীর অর্থসাহায্য নিয়ে বেশকিছু নতুন খাদ্যগুদাম নির্মাণ করা হচ্ছে। এ উদ্যোগ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে আশা করা যায়।

শেখ রোকন: সরকার এ মুহূর্তে আর কী কাজ করতে পারে?

শাইখ সিরাজ: এ পর্যায়ে সরকারের প্রধান কাজ দুটি। একটি হচ্ছে, প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনকারীদের ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া। বাংলাদেশের আশিভাগ অধিবাসী হচ্ছে কৃষক। তাদের ৯০ ভাগই ধান উৎপাদন করে। তারা প্রতিবারই ধান উৎপাদন করতে গিয়ে মার খায়। তাদের উৎপাদন খরচ উঠে আসে না। এখানে সরকারের হস্তক্ষেপের দরকার আছে। সরকার ধান কেনে সাধারণত চাতাল মালিকদের কাছ থেকে। সরকার এক্ষেত্রে যে ভর্তুকি দেয়, সেটা আদতে কৃষক পায় না। পায় চাতাল মালিক। সরকারের উচিত হবে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে চাল কেনা।

শেখ রোকন: সেটা তো খুব কঠিন কাজ হবে।

শাইখ সিরাজ: হ্যাঁ, কাজটি দুরূহ। ঘরে ঘরে গিয়ে ধান কেনা সম্ভব নয়। সরকার যদি একটি নির্দিষ্ট জায়গায়, নির্দিষ্ট দিনে ধান কেনার কথা বলতে পারে যে আজ এই অঞ্চলের ধান কেনা হবে। দ্বিতীয়ত, ধান উৎপাদন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনতে হবে। কৃষকের উপকরণ ব্যয় যে হারে বেড়েছে, বাজারমূল্য সে হারে বাড়েনি। গত বছর দেখা গেছে, এক কেজি ধান উৎপাদনে কৃষকের খরচ হয় ২২ টাকা। বিক্রি হয়েছে ১৬ থেকে ১৭ টাকায়। এমন লোকসান যাতে না হয়, সেজন্য ভর্তুকি বাড়িয়ে উপকরণ ব্যয় কমিয়ে আনতে হবে সরকারকে। সত্যিকার অর্থেই যেন কৃষক ন্যায্যমূল্য পায়, ভর্তুকিমূল্যে সার, বীজ, সেচ পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

শেখ রোকন: বাংলাদেশের সেচব্যবস্থা নিয়ে আপনার সাম্প্রতিক প্রতিবেদনটি আমরা দেখেছি। সার, বীজ, ডিজেল নিয়ে যদিও কিছু কথাবার্তা হয়, সেচ বোধহয় একেবারেই অনালোচিত।

শাইখ সিরাজ: সেচ নিয়ে তো একটা নৈরাজ্য চলছে। আগে এক বিঘা জমিতে সেচ দিতে যন্ত্রমালিক তিন-চারশ' টাকা নিত। এখন সেটা বাড়তে বাড়তে একেক জেলায় একেক রকম হয়ে গেছে। এখন কোনো কোনো জেলায় দু'হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়। তার চেয়েও নৈরাজ্য হচ্ছে, কোথাও কোথাও সম্পূর্ণ ফসলের চার ভাগের তিন ভাগই সেচযন্ত্র মালিক নিয়ে নেয়। এক ভাগ থাকে কৃষকের। কৃষক এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করলে পেটানো হয়। বছর দুয়েক আগে পাবনায় আমরা এমনটা হতে দেখেছি।

শেখ রোকন: সরকার ধান বা গম সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিচ্ছে। এর বাইরে আমরা আলুর হিমাগার দেখি। পচনশীল অন্যান্য কৃষিপণ্যের সংরক্ষণের ব্যবস্থা কী?

শাইখ সিরাজ: ধানের বাইরে এখন আরও অনেক ধরনের শাকসবজি চাষ হয় আমাদের দেশে। এগুলো সময়মতো বাজারজাত করতে না পারলে কৃষক মার খায়। সরকারের উচিত গ্রামপর্যায়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থা তৈরি করা। এখন ভরা মৌসুমে কৃষক পাঁচ কেজি টমেটো নিয়ে বাজারে যায়, পানির দামে বিক্রি করে ঘরে ফিরতে হয়। এগুলোর ভ্যালু অ্যাডিশনের ব্যবস্থাও করতে হবে। অর্থাৎ গোলআলু শুধু ভর্তা বা তরকারি খাওয়ার জন্য নয়, টমেটো কেবল সালাদ করার জন্য নয়, পেয়ারা কেবল কাঁচা চিবিয়ে খাওয়ার জন্য নয়। এগুলোর টিন প্রডাক্ট করতে হবে। একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে এ ধরনের ফসল ক্রয় ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে। সরকার এটা করতে পারে। নিজে না করে যারা গ্রামপর্যায়ে এ ধরনের শিল্প গড়ে তুলতে চায়, তাদের সুযোগ করে দিতে পারে। কোথাও কোথাও কিন্তু এমন উদ্যোগ শুরু হয়েছে। কোনো অঞ্চলে যদি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপিত হয়, সেটা চালু রাখার স্বার্থেই কৃষক কৃষি কাঁচামালের ন্যায্যমূল্য পাবে। কৃষকের নিরাপত্তা বিধানের জন্য সরকার কৃষি বীমাও চালু করতে পারে।

শেখ রোকন: এটা বোধহয় আমাদের দেশে একেবারে নতুন ধারণা।

শাইখ সিরাজ: এটা আমি দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি। সরকার এখন খানিকটা আমলে নিচ্ছে। ক্রপ ইন্স্যুরেন্স এজন্য দরকার যে, একজন কৃষক একশ' ভাগ ঝুঁকি নিয়ে ফসল ফলায়। শুধু দাম না পাওয়ার বা ফলন কম হওয়ার বিষয় নয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে তার ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সম্পূর্ণ ক্ষতিটা তারই হয়। এবার, তার পরের বার– এভাবে কয়েক বছর মার খেয়ে একজন কৃষক ঢাকা শহরে এসে রিকশা চালায়। মহাজনের কাছ থেকে টাকা এনে

ফসল ফলালে মহাজন তো তাকে ছাড়বে না। ফসলের বীমা থাকলে একজন কৃষক রাতারাতি দরিদ্র হয়ে যেত না। সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যেত না।

শেখ রোকন: কৃষি বীমার ব্যবস্থা কে করবে? আমাদের দেশে তো কৃষিঋণ ব্যবস্থাই ঠিকমতো গড়ে উঠল না। সরকারি দুটি কৃষি ব্যাংক নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। বেসরকারি ব্যাংকগুলোও কৃষিঋণ দিতে উৎসাহী নয়।

শাইখ সিরাজ: বীমার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করতে হবে। অন্যরা সহজে এগিয়ে আসবে না। সরকারি কৃষি ব্যাংকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগের কথা আপনি বলছেন, সেটা সত্য। ওই ঋণ নিয়ে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি হয়, সময়মতো পাওয়া যায় না। বেসরকারি ব্যাংকগুলো খুব সামান্য ঋণ দেয়। খুব সম্প্রতি ২৫ হাজার কৃষককে ঋণ দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, দেশের তুলনায় সেটা খুবই সামান্য। ক্ষুদ্রঋণদাতা সংগঠনগুলো তো কৃষককে রক্ত চোষার মতো চোষে। কৃষককে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে।

শেখ রোকন: এটা কি সাধারণ বীমা ব্যবস্থার মধ্যে সম্ভব?

শাইখ সিরাজ: আলাদা বীমা ব্যবস্থা দাঁড় করাতে হবে। যেমন প্রথমে ধানের ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না। যারা উচ্চমূল্যের ফসল আবাদ করে, তাদের বীমার সুযোগ থাকতে হবে। একজন কৃষক যদি ১০ বিঘা জমিতে বাউকুল চাষ করে, তার উৎপাদন খরচই হয় এক লাখ টাকার ওপরে। ওই ফসল মার খেলে সে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। টমেটো, স্ট্রবেরি, পেঁপে, পেয়ারার ক্ষেত্রে বীমা হতে পারে।

শেখ রোকন: সার সরবরাহ নিয়েও প্রতি বছর আমরা ঝামেলা হতে দেখি। বর্তমান কৃষিমন্ত্রী এর আগের মেয়াদে ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। এবারও চেষ্টা করছেন বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সার সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ে ইতিমধ্যে পত্রিকায় খবর দেখা যাচ্ছে। আপনার কী মত?

শাইখ সিরাজ: সারের মূল জটিলতা হচ্ছে সরবরাহ ব্যবস্থায়। আমাদের এখানে সার নিয়ে সংকটের চেয়ে বণ্টন নিয়ে সংকটটা বেশি হয়। সারের একটা সংকট হতে পারে ঘাটতি। হয়তো দরকার আটাশ লাখ মেট্রিক টন, আছে বিশ লাখ মেট্রিক টন। আট লাখ মেট্রিক টন ঘাটতি। কিন্তু আমাদের এখানে সমস্যা হচ্ছে, আটাশ লাখ মেট্রিক টন থাকার পরও সংকট হয়। প্রতিবার বোরো মৌসুমে সার নিয়ে একটা নৈরাজ্য হয়। ডিলাররা সমস্যা করে। কৃষক খোলা বাজারে সার চায়; কিন্তু এতে করে সরকার যে বস্তাপ্রতি এক হাজার টাকার বেশি ভর্তুকি দিচ্ছে, সেটা কৃষক পায় না। সরকার ডিলারদের দাম বেঁধে দেওয়ার পরও নৈরাজ্য হচ্ছে। যার যেমন খুশি দাম নেয়। এটা ঠিক, সারের ব্যবহার এখন অনেক বেড়েছে। কেবল ধান নয়– এখন সবজি, মাছচাষেও সার ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সারের ব্যবহার যে অনুপাতে বেড়েছে, এর বণ্টন ব্যবস্থা সে অনুপাতে আধুনিক হয়নি।

সারের অপচয়ও হয়। শুধু ফসলে নয়– মুড়ি ভাজতে, টেক্সটাইল মিলে এমনকি ইটখোলায়ও সার ব্যবহার হচ্ছে। বছর দুয়েক আগে আমি দেখেছি, যশোরে তামাক চাষে সার ব্যবহার হচ্ছে। কৃষকও অতিরিক্ত মাত্রায় সার ব্যবহার করে। সারের অপচয় কমালে সংকট অনেকখানি কমে যাবে।

শেখ রোকন: অপচয় কমানোর উপায় কী?

শাইখ সিরাজ: এজন্য প্রযুক্তি রয়েছে। গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার সারাদেশে বিস্তার করা যেতে পারে। এখন আমাদের কৃষক বিঘাপ্রতি ৫০ কেজি সার দেয়। গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করলে সেটা ৩০ কেজি হলেই হবে। লিফ কালার চার্ট ব্যবহার করে আরও কমিয়ে আনা সম্ভব। যত দ্রুত সম্ভব এসব প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। তাতে অর্থ সাশ্রয় হবে, কৃষক বাঁচবে, জমিও রক্ষা পাবে।

শেখ রোকন: এসব প্রযুক্তির ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে কথা হচ্ছে। আপনি টেলিভিশনে এগুলোর ব্যবহার দেখাচ্ছেন। তারপরওএসব প্রযুক্তির বিস্তার হচ্ছে না কেন?

শাইখ সিরাজ: আমার হিসাবে একটাই কারণ। সার হচ্ছে বছরে সাড়ে সতের কোটি টাকার বাণিজ্য। এর সঙ্গে অনেক চাঁই জড়িত। আমি মনে করি, তাদের কারণেই প্রযুক্তিগুলো মাঠপর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে না।

শেখ রোকন: কৃষির ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক আছে, বিশেষ করে হাইব্রিড বীজ নিয়ে।

শাইখ সিরাজ: সারা পৃথিবীতে এখন হাইব্রিড বীজ ব্যবহার হচ্ছে। আমাদের দেশে ওই বীজ নিয়ে বেশ বিতর্ক আছে। এটা হয় না বোঝার কারণে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে হাইব্রিড বীজ লাগবে। ট্র্যাডিশনাল বীজে এক বিঘা জমিতে ১০ মণের বেশি ধান পাওয়া যাবে না। উচ্চ ফলনশীল বীজে সেটা ৩০-৩৫ মণ। এখন সে ফলনও পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং প্রয়োজন হাইব্রিড বীজ। পরিবেশবাদীরা হাইব্রিড বীজের বিরোধিতা করছেন একদিক থেকে।

শেখ রোকন: পরিবেশবাদীরা বীজের অধিকার ও নিরাপত্তার প্রশ্নটি তুলতে চান। হাইব্রিড বীজের কারণেই বরং আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে তারা মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তো কৃষিতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর আধিপত্যের কথাও এসে যায়।

শাইখ সিরাজ: আমি ওই বক্তব্যের সঙ্গে একশ' ভাগ একমত। কিন্তু আপনি করবেন কী? জনসংখ্যা তো চারগুণ বেড়ে গেছে। আরও বাড়ছে। আগের ১০ মণ উৎপাদন দিয়ে চলবে? এটা ঠিক, হাইব্রিড বীজ আমাদের পরনির্ভরশীল করে তুলছে; কিন্তু বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে এছাড়া বিকল্প কী? দেশীয় বীজ দিয়ে এটা কখনোই সম্ভব নয়। হাইব্রিড বীজের অসুবিধা হচ্ছে, এটা কৃষক সংরক্ষণ করতে পারে না। উচ্চ ফলনশীল পর্যন্ত কৃষক রাখতে পারত। ফলে বীজের স্বত্ব চলে যাচ্ছে কোম্পানির কাছে। কৃষককে প্রতি বছর কিনতে হবে। কেনাটাও নির্বিঘ্ন হবে না। তারা মেকি সংকট তৈরি করবে। ১০ টাকার বীজ ২০ টাকায় বিক্রি করবে। এটাও দেখার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। এক্ষেত্রে বিএডিসিকে সচল করা যেতে পারে। বিএডিসি বীজের সিংহভাগ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করবে। তাহলেই কৃষক তার অধিকার হারাবে না। একইসঙ্গে আমাদের মূল বীজ সংরক্ষিত হচ্ছে কি-না সেটাও দেখতে হবে।

শেখ রোকন: এখন তো জিএমও নিয়েও পশ্চিমা বিশ্বে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে এর বিস্তার কতটুকু?

শাইখ সিরাজ : বাংলাদেশে এটা কিছু কিছু আসছে। আমি এর বিরুদ্ধে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো নিজেদের স্বার্থে এটা উদ্ভাবন করে আমাদের ওপর পরীক্ষা করছে। আমরা এর শিকার হতে পারি না।

শেখ রোকন: হাইব্রিড, জিএমও নিয়ে বিতর্ক চলতে দেখছি আমরা। এসবসহ কৃষির অন্যান্য দিক নিয়ে মৌলিক গবেষণা কতখানি হয়েছে বা হচ্ছে?

শাইখ সিরাজ: একটা সময় সাংঘাতিক গবেষণা হয়েছে। এখন সরকারি পর্যায়ে একেবারে হচ্ছে না বলা চলে। সত্তর-পরবর্তী গবেষণা দিয়েই কিন্তু আজ পর্যন্ত ১৫ কোটি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যাচ্ছে। কিন্তু নিজস্ব অর্থে গবেষণার চর্চা আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি। সদ্য স্বাধীন একটি দেশে গবেষণা খাতে দাতাগোষ্ঠীরা এগিয়ে এসেছিল। এখন তো আর আসছে না। আমাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য নিয়েই সংকট অনেক, কৃষি গবেষণার বিপুল অর্থ কোথায় পাব? খুব সম্প্রতি কৃষি গবেষণায় নামমাত্র অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু সরকার দেবেই বা কোথা থেকে? গবেষকদের বঞ্চনার দিকটিও ভাবতে হবে। আমাদের তিনশ' সাড়ে তিনশ' গবেষক অস্ট্রেলিয়া চলে গেছেন। তারা সেখানে এক মাসে যে বেতন পান, সেটা এখানে এক বছরেও পাবেন না।

শেখ রোকন: অভিযোগ আছে, কৃষি বিষয়ে আমাদের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় বহুজাতিক কোম্পানির হয়ে কাজ করে থাকে।

শাইখ সিরাজ: অনেকক্ষেত্রে। কৃষিক্ষেত্রে তৎপর বেসরকারি পক্ষগুলো এখন শক্তিশালী। তারা অর্থ গিয়ে গবেষকদের ভাগিয়ে নিচ্ছে। তারা এক লাখ টাকা ব্যয় করে এক কোটি টাকার কাজ করিয়ে নেবে। আমাদের বিজ্ঞানী ড. কাজী বদরুদ্দোজা অনেকদিন ধরে গবেষকদের বেতন কাঠামো নিয়ে কথা বলছেন। যে মানুষটির গবেষণাগারে কাজ করতে করতে দাড়িগোঁফ গজিয়ে যাবে, তার আরেকজন সাধারণ কর্মচারীর বেতন কাঠামো এক হওয়া উচিত নয়।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তো কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা আরও বাড়ানো দরকার। নোনা পানি, খরা, বন্যাসহিষ্ণু ধানের জাত প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে আমরা কতটা এগিয়ে আছি?
শাইখ সিরাজ: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব শুরু হয়ে গেছে। নোনা পানিসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন হয়েছে; কিন্তু বিস্তারে গতি ধীর। এটাকে দ্রুত ছড়িয়ে দিতে হবে। উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে খরাসহিষ্ণু জাত প্রয়োজন হবে। মধ্যাঞ্চলের আমন এলাকায় লাগবে বন্যাসহিষ্ণু জাত। এগুলোর দ্রুত উদ্ভাবন এবং দ্রুত মাঠপর্যায়ে কৃষকের হাতে পৌছাতে হবে। অর্থাৎ গবেষণা ও সম্প্রসারণ আগের চেয়ে অনেক দ্রুত করতে হবে। দশ বছরের কাজ এক বছরে করতে হবে।

শেখ রোকন: কৃষি সাংবাদিকতায় আপনাকে বাংলাদেশের জন্য এখন লিজেন্ড বলা যেতে পারে। সম্প্রতি আপনি এএইচ বোয়েরমা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। এখন কৃষি নিয়ে আগের চেয়ে বেশি লেখালেখি হচ্ছে। টেলিভিশন সাংবাদিকতা হচ্ছে। কৃষি পাতা হচ্ছে। সংবাদমাধ্যম আরও কীভাবে এগিয়ে আসতে পারে?
শাইখ সিরাজ: আমরা সাংবাদিকতাকে রাজনীতি ও অপরাধে কেন্দ্রীভূত করে রেখেছি। অথচ আমাদের দেশে উন্নয়ন সাংবাদিকতাই প্রধান হওয়া উচিত ছিল। আমাদের সংবাদমাধ্যমে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিট আছে; কিন্তু কৃষি বিট নেই। রাজনীতি নিয়ে প্রতিদিন হেডলাইন হয়, আগামী বছর খাদ্য ঘাটতি হবে কি-না, সেটা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। অথচ এক বছর খাদ্য না হলে সবকিছু ভেঙে পড়বে। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে কৃষি বিট নেই! এটা দুঃখজনক। আমি চেষ্টা করেছি। অন্যরা যদি আমার কাজে উৎসাহিত হয়ে কৃষি নিয়ে কাজ করে, সেটা আমার জন্য গর্বের। কিন্তু সেটা কৃষির জন্য কতটা উপকারে আসছে, পাঠকের জন্য কতটা অর্থপূর্ণ হচ্ছে, সেটাই প্রশ্ন। এখন এসব নিয়ে ভাবার সময় এসেছে।

দৈনিক সমকাল
৪ নভেম্বর, ২০০৯

ড. হাছান মাহমুদ

জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় বাংলাদেশ সোচ্চার থাকবে

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি এর আগে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৮৮ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রে অনার্স ও ১৯৮৯ সালে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জনের পর ব্রাসেলস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৩ সালে পরিবেশ বিজ্ঞানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি '৯৬ সালে ব্রাসেলস বিশববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। ড. হাছান ২০০১ সালে বেলজিয়ামের লিমবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'পরিবেশ রসায়নে' পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি পরিবেশ, প্রতিবেশ, পরিবেশ রসায়ন, আর্সেনিক প্রশমন, পরিবেশ আইন, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা, মানবাধিকার, তথ্য প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে বহু আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশ নিতে ৫০টির বেশি দেশ সফর করেছেন। ২০০১ সালে ড. হাছান আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর বিশেষ সহকারী নিযুক্ত হন। একই সময়ে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। ড. হাছান গ্রিনপিস ইন্টারন্যাশনালের অন্যতম সদস্য।

শেখ রোকন: কোপেনহেগেন সম্মেলন যদিও বৈশ্বিক সমঝোতার জন্য আয়োজিত হয়েছে, বাংলাদেশ এককভাবে এখান থেকে কতটুকু লাভবান হতে পারে?
হাছান মাহমুদ : কোপেনহেগেনে মূলত একটি গ্লোবাল সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করা হবে। সেক্ষেত্রে এলডিসি (লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজ) ও এমভিসিভুক্ত (মোস্ট ভালনারেবল কান্ট্রিজ) দেশ হিসেবে আমরা বলছি, অ্যাডাপটেশনের জন্য যে তহবিল সংগ্রহ হবে, তার ৭০ শতাংশ এলডিসিভুক্ত দেশগুলোকে দিতে হবে, তহবিলের পরিমাণ যা-ই হোক। এলডিসির মধ্যেও আবার অগ্রাধিকার দিতে হবে এমডিসিভুক্ত দেশগুলোকে। আমাদের দাবি, মূল সমঝোতা দলিলে স্থান পেলে বেশি বিপন্ন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ অগ্রাধিকার পাবে।

শেখ রোকন: আমরা দেখছি যে ভারত, চীন, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকাসহ কয়েকটি দেশের জলবায়ু সমঝোতা সংক্রান্ত অবস্থান এলডিসির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আবার ভারতের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে কোপেনহেগেনে সার্ক দেশগুলোর অভিন্ন অবস্থানের তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। আপনি বিষয়টিকে কীভাবে দেখবেন?
হাছান মাহমুদ : ভারতের দিক থেকে এমন আগ্রহ থাকতেই পারে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা এলডিসি জোটের জন্য সবচেয়ে সোচ্চার (মোস্ট ভোকাল)

দেশ। একই সঙ্গে আমরা চরম বিপন্ন দেশও (মোস্ট ভালনারেবল)। দক্ষিণ এশিয়া বা সার্কের সব দেশ এমভিসি নয়। পাকিস্তান নয়, ভারতও নয়। সুতরাং তাদের সঙ্গে জোট বেঁধে আমাদের কোনো লাভ নেই। এমভিসিভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতা বাড়ালে, তাদের একজন হলে, তাদের নেতৃত্ব নিলেই বরং আমাদের লাভ। আমরা সেটাই করতে যাচ্ছি। অবশ্য সার্কভুক্ত দেশ হিসেবে একটি অভিন্ন অবস্থান থাকতেই পারে। অ্যাডাপটেশনের জন্য তো নিজেদের মধ্যে সমঝোতা দরকার, সহযোগিতা দরকার। তবে সেটা এলডিসি বা এমভিসি অবস্থান ক্ষুণ্ন করে নয়।

শেখ রোকন: এলডিসি ও এমভিসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নেতৃস্থানে। এই দুটি জোটের অন্য দেশের সঙ্গে আমরা কীভাবে কাজ করছি?
হাছান মাহমুদ : আমরা এলডিসি-এমভিসিভুক্ত দেশগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছি। ওই দেশগুলো আমাদের নীতিগত প্রস্তুতিকে নজির হিসেবে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সমঝোতা ও দরকষাকষিতে এ দেশগুলোর স্বার্থ যাতে সংরক্ষিত হয় এবং আন্তর্জাতিক অ্যাডাপটেশন ফান্ড বা অভিযোজন তহবিল থেকে তারা যাতে যথাযথ অর্থ পায়, সেজন্য বাংলাদেশ সোচ্চার আছে, থাকবে।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় নীতিগত প্রস্তুতিতে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে আছে, সন্দেহ নেই। এত বড় একটি দুর্যোগের সামনে দাঁড়িয়ে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঐকমত্যও জরুরি। সেক্ষেত্রে আপনারা কী ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন?
হাছান মাহমুদ : এক্ষেত্রে সরকারি দল, বিরোধী দল, সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো বিভাজন নেই বলে আমি জানি। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছি। আপনি দেখবেন, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির, যেটি জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করে থাকে, সভাপতি হচ্ছেন বিএনপিদলীয় সংসদ সদস্য। জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে রাজনৈতিক ঐকমত্যের অভাব থাকার কোনো সুযোগ নেই বলে আমার বিশ্বাস।

শেখ রোকন: এক বছরের বেশি সময় ধরে আমরা মাল্টিডোনার ট্রাস্ট ফান্ডের কথা শুনছি। বাংলাদেশ তো এখন পর্যন্ত বোধহয় কোনো অর্থ হাতে পায়নি...
হাছান মাহমুদ : মাল্টিডোনার ট্রাস্ট ফান্ড কীভাবে পরিচালিত হবে, এগুলো নিয়ে আমরা এখনও আলাপ-আলোচনার মধ্যে আছি। ডেভেলপমেন্ট পার্টনাররা বলছে, এটি পরিচালিত হোক বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু রিজার্ভেশন আছে। আমরা চাই ওই তহবিল সরকারের মাধ্যমেই পরিচালিত হোক। কিন্তু ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের যুক্তি হচ্ছে, এজন্য সরকারের সামর্থ্য

বাড়ানোর (ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের) প্রয়োজন আছে। অর্থ যেহেতু ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের কাছ থেকে আসবে, তাই তাদের পরামর্শ উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমরা দুই মতের একটি সেতুবন্ধন করতে চাইছি। সেক্ষেত্রে মাল্টিলেটারাল ট্রাস্ট ফান্ড একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় থাকতে পারে। বিষয়টি খুব শিগগিরই সমাধান হবে বলে আমরা আশা করছি।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় অভ্যন্তরীণ তহবিল হিসেবেও গত দুই বাজেটে সাতশ' কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি কমিটিও সম্ভবত গঠিত হয়েছে। এ অর্থ কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে?

হাছান মাহমুদ : আমরা এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও যাচ্ছে। আমরা সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন পক্ষের কাছে এজন্য প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বান করছি।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তহবিল ব্যবস্থাপনার অধিকার নিয়ে সরকারের কোনো কোনো মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে দ্বিমত ছিল। এ বিষয়ে একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রতিবেদনও প্রকাশ হয়েছিল। এখন কি বিষয়টি সুরাহা হয়েছে?

হাছান মাহমুদ : এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অধীনেই আছে। আমি নিজে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান। ওই বোর্ড ইতিমধ্যে অনুমোদিত হয়ে কাজও শুরু করেছে। এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। আর মাল্টিডোনার ট্রাস্ট ফান্ড সবসময়ই, যে কোনো তহবিলের ক্ষেত্রে, বৈদেশিক সম্পদ বিভাগের (ইআরডি) মাধ্যমে আসে। ইআরডির মাধ্যমেই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে যায়। পরিবেশ সংক্রান্ত তহবিল হলে আমাদের কাছেই আসবে।

শেখ রোকন: আমরা অ্যাডাপটেশন বিশেষজ্ঞ ড. সলীমুল হকের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে দরকষাকষির জন্য একজন বিশেষ দূত নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারণ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নীতিনির্ধারকদের দেশেই অনেক দায়িত্ব থাকে। এ বিষয়টি আপনারা ভাবছেন কি-না?

হাছান মাহমুদ : ঠিক ওইভাবে আমরা ভাবিনি। আপনি জানেন, আমি এর আগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ছিলাম। এখন পরিবেশ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যৌথভাবে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও দরকষাকষির বিষয়টি করছি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ইতিমধ্যে একজন 'এম্বাসেডর অ্যাট লার্জ' নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনিও কাজ করছেন। আন্তর্জাতিক সমঝোতা বা দরকষাকষির ক্ষেত্রে আমাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তন

বিষয়ে আমাদের অফিসিয়াল নেগোসিয়েশন টিমে বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর কর্মকর্তারা রয়েছেন। তারা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষ এবং পেশাদার। আমাদের টিম খুবই দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করছে। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশের স্বার্থের বিষয়টি ওই টিম সাফল্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরতে এবং ন্যায্য অবস্থান তৈরি করতে পারছে। আমাদের কাজের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

শেখ রোকন: কেউ কেউ বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি যেহেতু দেশের প্রায় সব খাতকে প্রভাবিত করবে, এজন্য জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আলাদা একটি মন্ত্রণালয় হওয়া উচিত। আপনি কী মনে করেন?

হাছান মাহমুদ : আমার মনে হয় না। আমরা বরং পরিবেশ অধিদফতরের নাম পরিবর্তন করে ব্যুরো অব এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ করতে পারি। এ ব্যাপারে একটি প্রস্তাব অবশ্য ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী আগের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর সম্প্রসারণ এবং ধরন পাল্টানোর ওপর জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। পরিবেশ মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নিচ্ছে?

হাছান মাহমুদ : আমরা ইতিমধ্যে গোটা বাংলাদেশে উপকূলীয় বনায়নের পরিকল্পনা করেছি। উপকূলীয় বাঁধজুড়ে বনায়ন হবে। সাড়ে সাত লাখ একরের বেশি জমিতে নতুন করে সামাজিক বনায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি আমরা। আগে যেখানে সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকারীরা ৪৫ শতাংশ বখরা পেত, নতুন উদ্যোগে অংশগ্রহণকারীরা ৭৫ শতাংশ পাবে। বনায়ন নিয়ে পরিবেশ মন্ত্রণালয় আরও ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছে।

শেখ রোকন: সামাজিক বনায়নের আওতায় লাগানো কোনো কোনো গাছের প্রজাতি নিয়ে প্রশ্ন আছে। এগুলো পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বলে শোনা যায়। বিশেষজ্ঞদের অনেকে বিদেশি প্রজাতির বদলে বরং দেশীয় ও ফলদ গাছ লাগানোর পরামর্শ দিয়ে আসছেন। এ ব্যাপারে আপনাদের কী পরিকল্পনা?

হাছান মাহমুদ : হ্যাঁ, তারা ঠিকই বলেন। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এখানে বনায়নের জন্য স্থান সংকট রয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে পুষ্টির অপ্রতুলতাও রয়েছে। সেজন্য আমরা এখন পরিকল্পনা নিয়েছি যে, রাস্তার ধারে বনায়নের ক্ষেত্রে আগের তুলনায় বেশি হারে ফলের গাছ লাগানো হবে। সামাজিক

বনায়নের ক্ষেত্রেও আমরা বলে দেব অন্তত ২০ থেকে ৩০ শতাংশ যেন ফলের গাছ লাগানো হয়। এমন অনেক গাছ আছে, যেটির উড ভ্যালু আছে আবার ফলও দেয়। যেমন কাঁঠাল গাছ। এতে করে আমাদের দুটি লাভ হবে। বাংলাদেশের মানুষের ফলের চাহিদা মিটবে আবার একই সঙ্গে পরিণত হলে কাঠের চাহিদাও মেটাবে। বিষয়টিকে আমরা খুবই গুরুত্ব দিচ্ছি।

শেখ রোকন: পরিবেশ মন্ত্রণালয় যখন নীতিগত দিক থেকে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী বা সামাজিক বনায়নের দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে, তখন মাঠপর্যায়ে আমরা বন উজাড় হতে দেখছি। খুব সম্প্রতি টেকনাফ ও সীতাকুণ্ডে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছে। গত পরিবেশ কমিটির সভায় প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও...

হাছান মাহমুদ : আমার কাছে খবর আসামাত্রই পুলিশকে ফোন করে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। বন বিভাগের কর্মকর্তারাই আমাকে খবর দিয়েছেন যে গাছকাটার পাঁয়তারা হচ্ছে। কিন্তু যেভাবে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল, সেটা সম্ভব হয়নি। দুর্বৃত্তরা এক ঘণ্টার মধ্যে এক হাজার গাছ কেটে ফেলেছে। গাছপ্রতি একজন করে লোক নিয়েছিল। সময় বেশি হলে তারা কাটতে পারত না। তারপরও আমরা পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, বন সৃজন যদিও বন মন্ত্রণালয় করেছে, কিন্তু তারা ভূমির মালিক নয়। ভূমি হচ্ছে ভূমি মন্ত্রণালয়ের। দুর্বৃত্তরা ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দ নিয়ে সেটার জোরে গাছ কেটেছে। তারপরও যদি প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যেত, আমি নিঃসন্দেহে গাছ কাটতে দিতাম না।

শেখ রোকন: এ ধরনের তৎপরতা বন্ধে আগাম কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?

হাছান মাহমুদ : দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী আমি নিজেও যদি পৈতৃক জমিতে বন সৃজন করি, সেই গাছ কাটতে হলে সরকারের অনুমতি নিতে হবে। এ কথাটি আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনেকের জানা নেই। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় দেশের বনসম্পদ রক্ষায় সবসময় যত্নবান ও তৎপর। বিশেষ করে, আমাদের সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর। যারাই দায়িত্বে অবহেলা করে, তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আপনি দেখবেন, টেকনাফের ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। সীতাকুণ্ডে কিন্তু বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্বে অবহেলার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আমি মনে করি, প্রচলিত আইনের সঠিক প্রয়োগ হলেই কিন্তু দেশের বনসম্পদ রক্ষা করা সম্ভব।

শেখ রোকন: আমরা দেখলাম, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নিজেদের দেশের বিপন্নতা তুলে ধরার জন্য মালদ্বীপ ও নেপাল সরকার সম্প্রতি দুটি অভিনব কর্মসূচি নিয়েছে। মালদ্বীপ সরকার সাগরের তলদেশে এবং নেপাল সরকার এভারেস্টের

কাছে কেবিনেট মিটিং করেছে। বাংলাদেশও তো চরম ঝুঁকিতে থাকা দেশের একটি। আমাদের মন্ত্রিসভাও তো এ ধরনের কোনো কর্মসূচি নিতে পারে?

হাছান মাহমুদ : দেখুন, কেবিনেট মিটিং সাগরতলায় বা হিমালয়ের চূড়ায় আয়োজন করে মানুষকে চমকে দেওয়া যায় সন্দেহ নেই; কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে দেশকে বাঁচানো হচ্ছে মূল কাজ। এখন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিপন্ন একটি বা দুটি দেশের নাম বললে কিন্তু বাংলাদেশের নাম আসে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আমাদের সফল ক্যাম্পেইনের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। হ্যাঁ, মিডিয়া কভারেজ আকর্ষণ করার জন্য আমরা নৌকায় বা জাহাজে করে সাগরে গিয়ে কেবিনেট মিটিং করতে পারি; কিন্তু তাতে করে অ্যাডাপটেশন ফান্ড পেতে কতটা অবদান রাখবে, ভেবে দেখার বিষয়।

শেখ রোকন: শেষও করতে চাই কোপেনহেগেন সম্মেলন দিয়ে। সেখানে বাংলাদেশ সরকারের একটি বড়সড় প্রতিনিধি দল যাচ্ছে। আমরা অতীতে দেখেছি, শুধু পরিবেশ নয় অন্য মন্ত্রণালয়েও, এ ধরনের ডেলিগেশনের নামে অনেক সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একধরনের ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রবণতা বন্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি-না?

হাছান মাহমুদ : অন্য যে কোনো সম্মেলনের তুলনায় কোপেনহেগেনে সরকারি খরচে সবচেয়ে কম কর্মকর্তা-কর্মচারী যাচ্ছেন বলে আমি মনে করি। আমার মন্ত্রণালয় থেকে আমি ছাড়া আর কেউ সরকারি খরচে যাচ্ছেন না। শুধু এই সম্মেলনে যাতায়াতের জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে অনেকে সহায়তা করছে। শুধু কোপেনহেগেনে যাওয়া-আসার জন্য ওই অর্থ অন্য কোনো খাতে ব্যবহার করা যাবে না। নাগরিক সমাজ ও উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা নিজেদের খরচে যাচ্ছেন। তাদের আমরা বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি। ফলে ডেলিগেশনটি অনেক বড় মনে হচ্ছে; কিন্তু সরকারের খরচ খুবই সীমিত।

শেখ রোকন: কোপেনহেগেন সম্মেলনের এত ব্যস্ততার মধ্যেও আপনি সমকালকে সময় দিলেন, এজন্য ধন্যবাদ।

হাছান মাহমুদ : ধন্যবাদ।

দৈনিক সমকাল
৯ ডিসেম্বর, ২০০৯

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

সহায়তার জন্য বসে না থেকে নিজের সামর্থ্যের দিকে তাকাতে হবে

দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ গত বছর নভেম্বর থেকে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে তিনি কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। ২০০৭ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী জলবায়ু বিষয়ক জাতিসংঘ প্যানেল আইপিসিসির সদস্য জনাব আহমদ জলবায়ু বিষয়ক তহবিল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সরকারি কমিটির সঙ্গেও যুক্ত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি প্রবাসী সরকারের পরিকল্পনা সেলে কাজ করেছেন। পরে তিনি কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে (বিআইডিএস) গবেষণা পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন। জনাব আহমদ পরপর দু'দফা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ছিলেন। দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ২০০৯ সালে তাকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। ১৯৪৩ সালে মৌলভীবাজারে জন্মগ্রহণকারী কাজী খলীকুজ্জমানের শিক্ষাজীবন কেটেছে ওই জেলার রাজনগর পোর্টিয়াস হাইস্কুল, সিলেট এমসি কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্সে।

শেখ রোকন: আমরা নানাভাবে শুনেছি যে, বাংলাদেশ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চরম বিপন্ন দেশগুলোর একটি। আপনি কোপেনহেগেন সরকারি প্রতিনিধি দলে ছিলেন। ওই সম্মেলনে বাংলাদেশের বিপন্নতার বিষয়টি কতটা প্রতিফলিত হয়েছে? আমরা কতটা ফোকাস পেয়েছি?

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : কোপেনহেগেনে বাংলাদেশ খুবই আলোচিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর অন্যতম নয়, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সেটি সবাই স্বীকার করেছেন। বালি সম্মেলনের পর থেকে কোপেনহেগেন পর্যন্ত যেক'টি জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলন হয়েছে, বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল সব ক'টিতে বিষয়টি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও কয়েকটি শীর্ষ পর্যায়ের সম্মেলনে যোগ দিয়ে কথাটি বলেছেন। কোপেনহেগেন সম্মেলনের প্রথম দিনই বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দেওয়ার সময় আইপিসিসি চেয়ারম্যান রাজেন্দ্র পাচুরি বাংলাদেশের কথা বলেছেন। পরে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন ও যুক্তরাষ্ট্রের

প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাসহ গুরুত্বপূর্ণ অন্য বক্তারাও বাংলাদেশের বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

শেখ রোকন: সরকারি-বেসরকারি মিলে বিরাট একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ থেকে কোপেনহেগেনে যেতে দেখেছি আমরা। সম্মেলনে আমাদের বিষয়টি যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য অন্যান্য প্রস্তুতি কেমন ছিল?

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : আমাদের প্রস্তুতি ভালো ছিল। সম্প্রতি আমরা জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কৌশল বা ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি তৈরি করেছি। সাতশ' কোটি টাকার নিজস্ব তহবিল দিয়ে একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। তহবিল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি কমিটি করা হয়েছে।

শেখ রোকন: আপনিও তো ওই কমিটিতে আছেন।

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : হ্যাঁ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আমরা কী করতে পারি, সে ব্যাপারে ওই কমিটি কাজ করছে। এ বিষয়ে কারা কী কাজ করতে চান, এ ব্যাপারে প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। কাজের প্রস্তাব, আমি দরপত্র বলতে চাই না। আশা করছি, খুব শিগগিরই কাজ শুরু হবে।
কোপেনহেগেন সামনে রেখে এসব প্রস্তুতি তো ছিলই, সম্মেলনে কী করতে পারি, সে ব্যাপারে বেশকিছু দিন ধরে আলোচনাও করেছি আমরা। এটি ঠিক, আরেকটু সমন্বয় হলে ভালো হতো।

শেখ রোকন: সম্মেলনে গিয়ে প্রতিনিধি দল কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পেরেছে?

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : সরকারি প্রতিনিধি দলে যারা গেছেন, তারা সবাই সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। আমরা যে নিজেরা কাজ করার চেষ্টা করছি, আমরা যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ, তা সম্মেলনে তুলে ধরতে চেয়েছি। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অনেক কারণ আছে। সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে বড় জনসংখ্যা। ভৌগোলিকভাবেও অসুবিধাজনক অবস্থায় আছি আমরা– তিনটি বড় অববাহিকার ভাটি, দীর্ঘ উপকূল। দারিদ্র্যও প্রকট। এ কথাগুলো বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল কোপেনহেগেনে সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরতে পেরেছে।

শেখ রোকন: কিন্তু কোপেনহেগেন সম্মেলন তো প্রত্যাশা পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বলে সমালোচনা করা হচ্ছে। চুক্তির বদলে সেখানে একটি অঙ্গীকারনামা পাওয়া গেছে। আপনার মূল্যায়ন কী?

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : এর আগে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনার কারণে কোপেনহেগেন সম্মেলন নিয়ে একটি আশাবাদ তৈরি হয়েছিল। জলবায়ু

পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক দিকটি তো বালি সম্মেলনেই স্বীকৃত ছিল। এবারের সম্মেলনে প্রত্যাশা ছিল উন্নত দেশগুলো গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে আনতে বাধ্য হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও প্রযুক্তি দেওয়ার দায় নেবে। আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক একটি চুক্তি হবে। তা হয়নি। সেদিক থেকে অনেকে বলতেই পারেন, কোপেনহেগেন সম্মেলন সফল হয়নি।
এটি ঠিক, কোপেনহেগেন সম্মেলনে একেবারে শেষ রাতে যে অঙ্গীকারনামা গৃহীত হয়েছে, তা আইনগত দিক থেকে বাধ্যতামূলক নয়, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। যে কোনো পক্ষ পরে নাও মানতে পারে। এটি প্রস্তাবও করেছে সবচেয়ে বেশি গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণকারী পাঁচটি দেশ– যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত। পর দিন ১৯৩টি দেশের সভায় অঙ্গীকারনামাটি সেভাবে গৃহীতও হয়নি। জাতিসংঘের বিবেচনায় এটি হচ্ছে 'নোট'।
আমি মনে করি, কোপেনহেগেনের অঙ্গীকারনামার কারণে আগামী দিনে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার একটি ভিত্তি তৈরি হয়েছে। প্রস্তাবকারী দেশগুলো বলছে যে, তারা বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে এবং দীর্ঘমেয়াদে দেড় ডিগ্রিতে নামিয়ে আনা হবে। কিন্তু কোন দেশ কতটা কমাবে, কতদিনের মধ্যে কমাবে তা বলা হয়নি। বলা হয়েছে সব দেশ আগামী বছর ৩১ জানুয়ারির মধ্যে জানাবে, তারা কে কী করবে। আমি বলতে চাচ্ছি, এ সমঝোতার মাধ্যমে একটি ভিত রচিত হয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে আমরা আলোচনা চালিয়ে যেতে পারি, যাতে করে ২০১০ সালের নভেম্বরে মেক্সিকোয় আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক একটি চুক্তিতে পৌঁছা যায়।

শেখ রোকন: কোপেনহেগেন সম্মেলনের এ ফলাফল বাংলাদেশের জন্য কী বয়ে আনবে?
কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ বাংলাদেশের অন্যরা যে বারবার চরম বিপন্ন দেশ বা এমভিসির (মোস্ট ভালনারেবল কান্ট্রিজ) কথা উল্লেখ করে আসছেন, সেটি কিন্তু কোপেনহেগেন দলিলে স্বীকৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, খাপ খাওয়ানোর জন্য যে অর্থ সংগ্রহ হবে তার হিস্যা দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাবে এমভিসি। প্রযুক্তি স্থানান্তরের ক্ষেত্রেও এসব দেশের অগ্রাধিকারের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমরা যে কথাগুলো কোপেনহেগেন সম্মেলন ও তার আগে বলে আসছি, তা অত্যন্ত সফল হয়েছে বলে আমি মনে করি।

শেখ রোকন: তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, কোপেনহেগেন সম্মেলন সামগ্রিকভাবে প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলেও বাংলাদেশের জন্য সাফল্য বয়ে এনেছে?

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: বাংলাদেশ যথেষ্ট সফল হয়েছে বলে আমি মনে করি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, এটি মোকাবেলায় আমাদের যে অর্থের প্রয়োজন, প্রযুক্তির প্রয়োজন সেটি এ সম্মেলনে স্বীকৃত হয়েছে। আমরা বলেছি যে, আমাদের সীমিত সম্পদ ও সুযোগে যতটুকু কাজ করার আমরা করছি। কৌশল প্রণয়ন করেছি, এখন এটি দ্রুত বাস্তবায়ন দরকার। এখন তোমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমরা বসে নেই, তোমরাও দায়িত্ব পালন কর– এই বার্তা আমরা কোপেনহেগেনে গিয়ে উন্নত বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিয়েছি।

শেখ রোকন: গত দু'বছর ধরে বাংলাদেশ নীতিগত দিক থেকে উল্লেখযোগ্য প্রস্তুতি নিয়েছে। কোপেনহেগেন সম্মেলনের সামগ্রিক ব্যর্থতা তাতে কি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে?
কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : আমি মনে করি, ইতিবাচক প্রভাব পড়া উচিত। আমাদের উৎসাহিত হওয়া উচিত।

শেখ রোকন: অঙ্গীকারনামায় তিন বছরের জন্য ১০ বিলিয়ন ডলার করে অভিযোজন তহবিলের কথা বলা হয়েছে। এটি কতটা বাস্তবসম্মত?
কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : মুশকিল সেখানেই। আশা করা হয়েছিল অনেক বেশি। এলডিসি বা এমভিসি এ অংককে খুবই কম মনে করছে। অর্থ কারা দেবে, কীভাবে বণ্টিত হবে তার একটি ব্যবস্থাপনা কাঠামো করা হয়েছে। সেখানে অর্ধেক প্রতিনিধি থাকবে উন্নয়নশীল দেশ থেকে, অর্ধেক থাকবে উন্নত দেশ থেকে। আমার মনে হয়, এটি ভালো দিক। তবে অর্থায়নের বিষয়টি আরেকটু বিস্তারিত হলে ভালো হতো।

শেখ রোকন: অভিযোজন ফান্ডে বাংলাদেশের হিস্যা কীভাবে নিশ্চিত হবে? কত অংশ পাবে, কখন পাবে।
কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : না হয়নি। এটি তো ছোট দলিল, হওয়ার কথাও নয়। চুক্তি হবে গ্লোবালি। তখন এমভিসি, এলডিসিভুক্ত হিসেবে বাংলাদেশ তার অংশ পাবে। অবশ্য আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। সেটি বিবেচিত হবে নিশ্চয়ই। কত টাকা আসবে, কীভাবে আসবে, সেটি আরও পরে স্পষ্ট হবে। আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাব।

শেখ রোকন: তাহলে মেক্সিকো সম্মেলনের আগে আমরা কোনো অর্থ পাচ্ছি না এটি নিশ্চিত বলা যায়।
কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : হ্যাঁ, তা বলা যায়।

শেখ রোকন: জলবায়ু বিষয়ে দ্বিপক্ষীয় কিছু তহবিলের কথা শোনা গেছে, সেগুলোর কী অবস্থা?

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : যুক্তরাজ্য ৭৫ মিলিয়ন পাউন্ড সহায়তার কথা ঘোষণা করেছে। আরও কিছু দেশ আগ্রহী হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে সেগুলো আসতে পারে। আমি মনে করি, আমরা নিজেরা যত কাজ করব, সহায়তা তত বেশি আসবে।

শেখ রোকন: মাল্টিডোনার ট্রাস্ট ফান্ড ব্যবস্থাপনা কে করবে, তা নিয়ে বোধহয় সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বিমত আছে...।

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : একটা মত হচ্ছে মাল্টিডোনার ট্রাস্ট ফান্ড যারা দেবে, তারা ব্যবস্থাপনায় থাকবে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, তহবিল ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের নেতৃত্ব থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক পক্ষগুলো কারিগরি সহায়তা দিতে পারে।

শেখ রোকন: আমরা নিজেদের সামর্থ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কতটুকু করতে পারি?

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : সহায়তার জন্য বসে থাকার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের দিকে অবশ্যই তাকাতে হবে। নিজেদের শক্তি সম্প্রসারিত, সমৃদ্ধ ও ব্যবহার করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের দাবি করছি আমরা– ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য উন্নত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দেশের অভ্যন্তরেও তো ন্যায়বিচার দরকার। বাংলাদেশের চরাঞ্চলীয় বা উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সবচেয়ে বেশি পড়বে। বিদ্যমান অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে তাদের স্বার্থে রূপান্তরিত করাও ন্যায়বিচার। এ কথাগুলো ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি পেপারে বলা আছে। বলা হয়েছে, অর্থনীতি ও জলবায়ু পরিবর্তনকে আলাদভাবে দেখা যাবে না। একসঙ্গে মিলিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।

শেখ রোকন: অভিযোগ আছে বিপন্ন দেশগুলোর নেতা হিসেবে বাংলাদেশ কোপেনহেগেন সম্মেলনে যতটা জোরালো ভূমিকা নেওয়ার কথা ছিল, ততটা নেয়নি। বরং প্রভাবশালী পক্ষগুলোর সঙ্গে এক ধরনের সমঝোতা করেছে। সরকারি প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে আপনার কাছে এর কোনো জবাব আছে?

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : বিষয়টি হচ্ছে, সেখানে আমরা বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরতে চেয়েছি। এটি একটি রাজনৈতিক ব্যাপার। নিজেদের অবস্থান রক্ষায় তো যে কারও সঙ্গেই আলোচনা বা সমঝোতা হতে পারে। এতে তো আমি দোষের কিছু দেখছি না। কোপেনহেগেনের আলোচনায় যে এমভিসির কথা এসেছে, এলডিসির কথা এসেছে, আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলোর কথা এসেছে, তা কিন্তু বাংলাদেশের জন্যই সম্ভব হয়েছে বলে আমি মনে করি। মনে করা নয়

কেবল, আমি জানি। বাংলাদেশের তৎপরতার কারণেই কোপেনহেগেন দলিলে এমভিসি ও এলডিসির কথা স্থান পেয়েছে।

এখন বাংলাদেশ অফিসিয়ালি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর নেতৃত্বে নেই। কিন্তু সব জায়গায় এলডিসি কিংবা এমভিসির পক্ষে বাংলাদেশই বেশি সোচ্চার। আন-অফিসিয়ালি বাংলাদেশের কাছেই নেতৃত্বে রয়েছে। অফিসিয়াল নেতৃত্বও এখনকার পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের কাছে থাকা উচিত বলে আমি মনে করছি। আমি যতদূর জানি, খুব শিগগিরই বাংলাদেশে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর একটি সম্মেলন হচ্ছে। সেখানে বিষয়টি উত্থাপিত হতে পারে।

শেখ রোকন: কোপেনহেগেনে আমরা দেখলাম, প্রভাবশালী দেশগুলোর মতই শেষ কথা। এর মধ্যে প্রতিবেশী ভারতও আছে। সেখানকার নাগরিক সমাজের পক্ষে জলবায়ু ইস্যুতে দক্ষিণ এশীয় অবস্থানের পক্ষে জোর দেওয়া হচ্ছে। কিছুদিন আগে দ্য হিন্দুতে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ নাশিদের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ হয়েছিল। সেখানেও তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। বাংলাদেশের অবস্থান কী হতে পারে?

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : সেটি বাংলাদেশ সরকার ঠিক করবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, জলবায়ু ইস্যুতে দক্ষিণ এশিয়ার একটি অবস্থান থাকা দরকার। সার্কের আওতায় কিন্তু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দলিল রয়েছে। আন্তর্জতিক পরিমণ্ডলেও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার একসঙ্গে কথা বলার চেষ্টা চালাতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ায় সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট মোকাবেলা করতে পারি।

একটি সমস্যা হতে পারে, দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশের স্বার্থ এক নয়। সব দেশ এলডিসি বা এমভিসিও নয়। এছাড়া বাংলাদেশ জি-৭৭সহ আরও নানা গোষ্ঠীর অংশ। কেবল দক্ষিণ এশিয়াকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে জোটবদ্ধ অন্য অবস্থান যেন ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সর্বোপরি নিজের দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। সেটির ভিত্তিতে অনেকের সঙ্গে মিল-অমিল থাকতে পারে।

শেখ রোকন: কেউ কেউ বলছেন জলবায়ু বিষয়ক আলাদা একটি মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক সমঝোতা কার্যক্রমের জন্য একজন বিশেষ দূত নিয়োগ করা দরকার। আপনি কী বলেন?

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : আমাদের কৌশলপত্রে সব মন্ত্রণালয়ে একটি করে ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল গঠনের প্রস্তাব রয়েছে। কারণ জলবায়ু পরিবর্তন কেবল একটি দিকের সঙ্গে যুক্ত নয়। আমার মনে হয় সেগুলোকে শক্তিশালী করা দরকার। হ্যাঁ, সমঝোতা প্রক্রিয়া একজন যদি সমন্বয় করেন, তাহলে তো ভালোই হয়।

শেখ রোকন: রাজনৈতিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত এ দেশে জলবায়ুর মতো সর্বব্যাপ্ত একটি বিষয়ে ঐকমত্যও তো জরুরি।

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : এই একটি বিষয়ে কিন্তু দেখেছি যে রাজনৈতিক ঐকমত্য আছে। সংসদ সদস্যদের ওরিন্টেশনের সময় আমি দেখেছি সব দলের সাংসদরাই এসেছেন। বিরোধী দল সংসদে যাচ্ছে না বটে, সংসদের বাইরে বিভিন্ন সেমিনারে আমি গেছি। সেখানে সব সদস্য এক সুরে কথা বলেছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো দ্বিমত দেখিনি।

শেখ রোকন: শেষ প্রশ্নটি করি। কোপেনহেগেনে আপনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শত শত প্রতিনিধিকে দেখেছেন। হতে পারে, তাদের কেউ সমঝোতা প্রক্রিয়ায় ছিলেন, কেউ বিক্ষোভ করেছেন। কিন্তু সবার আকুতি ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচানো। এসব দেখে আপনার কী মনে হয়েছে? পৃথিবীকে বাঁচাতে পারব আমরা?

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : এক্ষেত্রে বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে সব দেশের নেতৃত্ব নিজের দেশের স্বার্থ দেখছে। সে আঙ্গিক থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্ব মানবতার দৃষ্টিতে জলবায়ু ইস্যুকে দেখবে, এমন কাউকে দেখছি না। সে ধরনের নেতৃত্ব না হলে আমরা কতদূর এগুতে পারব ভাবার বিষয়। ধরুন কোপেনহেগেনে একটি সমঝোতা হলো, মেক্সিকোয় আইনিভাবে বাধ্যতামূলক একটি চুক্তি হলো; কিন্তু সেটি যদি কেউ না মানে, তাহলে কী হবে? কিয়োটো প্রটোকলও তো আইনিভাবে বাধ্যতামূলক ছিল। এখন বিশ্ববাসী কত বেশি সচেতন, বিভিন্ন দেশের নেতৃত্বের মানসিকতার পরিবর্তন কেমন হয়, তার ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ।

শেখ রোকন: আমরা সে প্রত্যাশাই করি। কোপেনহেগেনের দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও ভ্রমণ থেকে শ্রান্ত হয়ে আপনি ফিরেছেন বেশি সময় হয়নি। এর মধ্যেও সমকালকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

খলীকুজ্জমান আহমদ : আপনাকেও ধন্যবাদ। সমকালের পাঠকদের জন্য শুভেচ্ছা।

দৈনিক সমকাল
২৩ ডিসেম্বর, ২০০৯

ড. রাজেন্দ্র কুমার পাচুরি

বিজ্ঞান ও নীতির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের কাজ করে চলছে আইপিসিসি

ভারতীয় অধ্যাপক ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ড. রাজেন্দ্র কুমার পাচুরি ২০০২ সালে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে শীর্ষ বৈজ্ঞানিক সংস্থা আইপিসিসির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালে তিনি জ্বালানি, পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে নয়াদিল্লিভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'তেরি'তে (টাটা এনার্জি রিসার্চ ইনস্টিটিউট) পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি সেখানকার মহাপরিচালক ও তেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। রাজেন্দ্র পাচুরি ১৯৪০ সালে ভারতের নৈনিতালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তার নেতৃতে প্রণীত আইপিসিসির চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে হিমালয় অঞ্চলের হিমবাহ গলে যাওয়ার সময়সীমা নিয়ে ২০১০ সালের গোড়ায় বিশ্বব্যাপী ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়। এ সময় ইকোনমিস্ট পাচুরির যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে, এটি তার সংক্ষেপিত ভাষান্তর।

ইকোনমিস্ট : আমার মনে হয় আমরা হিমবাহ ইস্যুতেই শুরু করতে পারি। ওই অনুচ্ছেদের ভুলটি প্রথম কখন আপনার চোখে পড়ল?

রাজেন্দ্র পাচুরি : সত্যি কথা বলতে, আইপিসিসির পুরো রিপোর্টটা আমি পড়েছি তড়িঘড়ি করে; কিন্তু এ বিশেষ বিষয়টি কখনোই আমার নজরে আসেনি। আর এ কারণেই এটা ঘটেছে। তা ছাড়া আরেকটি বিষয় হলো, গত আড়াই বছরে এ বিষয়ে অনেক জায়গায় আমি কথা বলেছি; কিন্তু কখনোই আমি ফিগারটি ব্যবহার করিনি। কোথাও আমি এ কথা বলিনি যে, ২০৩৫ সালের মধ্যে হিমালয়ের বরফ গলে যাবে। যদি আমি এটা দেখতামও সম্ভবত তা সত্ত্বেও এ রকম তথ্য আমি কোথাও ব্যবহার করতাম না। কারণ আইপিসিসির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিষয়টি খাপ খায় না। আইপিসিসি বিভিন্ন মাত্রার সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে বলে। কী ঘটতে পারে– এমন দৃশ্যচিত্র আমরা তুলে ধরি; কিন্তু জ্যোতিষবিদ্যার মতো ভবিষ্যদ্বাণী আমরা করি না।

ইকোনমিস্ট : ড. হাসনাইন নাকি মনে করেন, এ রিপোর্টে তাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তেরির সঙ্গে তিনি দু'বছর ধরে কাজ করছেন। আপনাদের মধ্যে কখনো কি বিষয়টি আলোচনায় এসেছিল?

রাজেন্দ্র পাচুরি : সত্যি বলতে কি, অধ্যাপক হাসনাইনের সঙ্গে আমার খুব কম সময়ই যোগাযোগ হয়। অধিকাংশ সময়ই তিনি বাইরে থাকেন। তাই তার সঙ্গে কখনো আলোচনা করার সুযোগ হয়নি।

ইকোনমিস্ট : ২০০৯ সালের ১৩ মে 'তেরি'তে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিবেশ বিভাগের সায়েন্টিফিক অফিসার আন্তাসতাসিওস কেন্ত্রাচোস রিপোর্টটিকে একটি ভিউগ্রাফে উদ্ধৃত করেছিলেন। আপনিও সেখানে মূল ভাষণ দিয়েছিলেন। তার বক্তব্য প্রদানের সময় আপনি কি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না?

রাজেন্দ্র পাচুরি : যখন আমি কোথাও মূল বক্তা হিসেবে ভাষণ দেই, ভাষণ শেষ হওয়ার পরপরই আমি সে স্থান ত্যাগ করি। কোনো ওয়ার্কশপে ভাষণ শেষ করার পর আমি আর বসি না। কারণ, তেরিতে একই সময়ে ৩/৪টি ইভেন্ট চলে। যদি সেগুলোর কোনো একটিতে আমি বসতাম, তাহলে আমাকে শুধু সে কাজই করতে হতো। অন্য কোনো কাজ করার উপায় থাকত না।

ইকোনমিস্ট : আপনি হিমবাহবিদ নন; কিন্তু গত বছর (২০০৯ সালে) হিমবাহ পরিস্থিতি সম্পর্কিত ড. রায়নার রিপোর্ট নিয়ে কিছু কঠিন কথাবার্তা বলেছিলেন। আপনি বলেছিলেন, 'যা দেখছি এটা পুরোটাই নিষ্ফল এবং যা তিনি বলেছেন তা অনেক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলোকে উল্টে দিচ্ছে।'

রাজেন্দ্র পাচুরি : তা ঠিক। হিমালয়ের বরফ আদতে গলছে কি-না সে বিষয়টিকে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ করেছিলেন। আমি কেবল সে ব্যাপারেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলাম। তিনি উল্লেখ করেছিলেন, কিছু বরফ গলছে না। আর যতটুকু গলছে তা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গলছে না। ওটা তখন মনে হয়েছিল। আর এখনও এ ধারণাকে আমার নিষ্ফল বলেই মনে হচ্ছে।

ইকোনমিস্ট : জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হিমালয়ের বরফ ক্রমাগত গলছে তার কোনো প্রমাণ কি আছে?

রাজেন্দ্র পাচুরি : আমি মনে করি চীনারা যে পরিমাণ গ্রিনহাউজ গ্যাস উদ্গিরণ করছে, সেদিকে দেখলেই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই যে হিমালয়ের বরফ গলছে, সে সম্পর্কে একটা শক্তিশালী প্রমাণ পাবেন। আমি এটাকে দেখেছিলাম ব্যাখ্যা করার মতো নয় এমন একটি বিষয় হিসেবে। তবে হিমালয়ের অপর পাশে যা ঘটছে সে সম্পর্কে আমাদের কিছু ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু সে ব্যাখ্যাগুলো আবার হিমালয়ের এ পাশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার মতো নয়।

ইকোনমিস্ট : জলবায়ুর ওপর ভূগোলের কী কোনো প্রভাব আছে? এমন কোনো বিষয় যা কোনো পর্বতের এক পাশের জন্য প্রযোজ্য, অপর পাশের জন্য নয়...

রাজেন্দ্র পাচুরি : আপনার সঙ্গে একমত; কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের মতো একটি বৈশ্বিক বিষয় নিয়ে যখন আপনি কথা বলছেন, তখন পর্বতের সব পাশের জন্যই এটি প্রযোজ্য হতে পারে। আমি বলতে চাচ্ছি, বরফ গলনের ভিন্ন ভিন্ন হার থাকতে পারে। সেটা আলাদা ইস্যু। হিমালয় অঞ্চলে বরফ গলার হার নিয়ে আমরা সমালোচিত হয়েছি; কিন্তু পৃথিবীব্যাপী যে বরফ গলতে শুরু করেছে, সেটা কীভাবে হতে পারে?

ইকোনমিস্ট : ঠিক বলেছেন। ২০০৬ সালে ড. কাসের প্রথম বিষয়টি টিএসইউর (আইপিসিসির টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউনিট) নজরে আনেন। তিনি দেখান আফ্রিকা অধ্যায় রচিত হওয়ার আগেই তিনি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কিলিমাঞ্জারো পর্বতমালায় বরফ গলার বিষয়টি আলোকপাত করেছিলেন; কিন্তু সেটা লিখিত হয়নি।

রাজেন্দ্র পাচুরি : ওটা কেবল একজন বিজ্ঞানীর অভিমত। আমি তাকে সম্মান করি; কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানী এ ব্যাপারে কী বলছেন সেদিকেও আপনাকে খেয়াল করতে হবে।

ইকোনমিস্ট : এটা সত্য। শেষ পর্যন্ত আইপিসিসি কিন্তু ড. কাসেরের সঙ্গে একমত হয়েছিল। আর আফ্রিকা অধ্যায় এখন সেভাবেই পড়া হয়...

রাজেন্দ্র পাচুরি : যা আমি পড়েছি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিলিমাঞ্জারোয় তার চেয়ে পরিমাণে খুব অল্প তুষার রয়েছে। বরফ আচ্ছাদনও এখন কমে গেছে। তাই তার অভিমত সঠিক হতে পারে এবং যে কারণেই আমরা ওটা গ্রহণ করেছি।

ইকোনমিস্ট : কিন্তু একই সময়ে এশিয়া অধ্যায় সম্পর্কে তিনি অভিযোগ করেছেন এবং সে সম্পর্কে কোনো কিছুই করা হয়নি...

রাজেন্দ্র পাচুরি : যে সব লোক এ সম্পর্কে কিছু করতে পারত, তাদের সঙ্গে কখনোই যোগাযোগ করা হয়নি। এটা ছিল যোগাযোগের ব্যর্থতা।

ইকোনমিস্ট : এ ছাড়াও অন্য দুটি অধ্যায়ে এ রকম করা হয়েছে। কারণ, অন্য দুটি অধ্যায়ে পরিবর্তনের ব্যাপারে যেসব সাজেশন তিনি দিয়েছেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এশিয়া অধ্যায়ের ব্যাপারে তা করা হয়নি।

রাজেন্দ্র পাচুরি : কারণ সম্ভবত সঠিক লেখক না পাওয়া। এটা একটা ঐতিহাসিক ইস্যু, কিন্তু বিষয়টি আমি জানি না। আমি সত্যিই জানি না, কে কাকে কী বলেছিল? সত্যিই এটা একটা জটিল বিষয়। কিন্তু আমি নিশ্চিত এটা যদি টিএসইউ কিংবা ওয়ার্কিং গ্রুপ-২ এর সহ-সভাপতির নজরে আসত, আমার বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে তারা এটা উপেক্ষা করত।

ইকোনমিস্ট : যখন আপনি বললেন, আপনি অধ্যাপক রায়নার কাজ বাতিল করেছেন, তার পেপার পড়ার পর শুধু সেই ভিত্তিতেই কী এটা করেছিলেন?
রাজেন্দ্র পাচুরি : এটা ছাড়াও পৃথিবীর আরও কিছু জায়গা সম্পর্কে আমি পড়েছি। এটা আমার কাছে খুবই অদ্ভুত মনে হয়েছিল। আমাদের বরফ আদৌ গলছে কি-না সে ব্যাপারে সেখানে এমন কিছু খুঁজে পেয়েছিলাম যা খুবই নিষ্ফল মনে হয়েছে। এ সবের কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণও ছিল না। কিন্তু বাস্তবতা হলো হিমালয়ের বরফগুলোর ক্ষেত্রে কী ঘটছে সে সম্পর্কে আমাদের পর্যাপ্ত তথ্য নেই। এর কারণটাও আমি জানি। আমি বুঝি, এটা পুরোটাই হয়েছে তথ্যের অভাবে। বলতে গেলে বরফের একটি ক্ষুদ্র অংশ অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হলেও বলা যায় সেগুলো গলছে না।

ইকোনমিস্ট : বলা হয়ে থাকে কোপেনহেগেন সম্মেলনের আগেই আপনি বিষয়টি জেনেছিলেন। কিন্তু কোপেনহেগেন সম্মেলনের আগে আপনি এ বিষয়ে কথা শেষ করেননি। 'সায়েন্স' পত্রিকার সাংবাদিক পল্লব বাগলা লিখেছেন, কোপেনহেগেন সম্মেলনের আগে অনেক ই-মেইল এবং আলোচনার মাধ্যমে তিনি আপনাকে ভুলটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন।
রাজেন্দ্র পাচুরি : আমি সম্ভবত সেই ই-মেইলগুলো পড়িনি। আপনি হয়ত অনুমান করতে পারেন প্রত্যেক দিন হাজার হাজার ই-মেইল আমার কাছে আসে। সেগুলোর একটা হিসাবও আমি আপনাকে দিতে পারি।

ইকোনমিস্ট : আমি নিশ্চিত আপনি চাইলে করতে পারতেন।
রাজেন্দ্র পাচুরি : আসলে তার সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি। আমার যতদূর মনে পড়ে কোনো এক সংবাদ সম্মেলনে ইস্যুটি তিনি উত্থাপন করেছিলেন। সেখানে আরও ৩০ জন সাংবাদিক ছিলেন। আমার অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে, সেখানে একটা ভুল হয়েছে- এ রকম কথাই তিনি বলেছিলেন। আমি বলেছিলাম, না। আমরা পঞ্চম মূল্যায়ন প্রতিবেদন নিয়ে কাজ করছি। যতদূর আমি জানি, চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এ রকম কিছু আছে। সুনির্দিষ্টভাবে তার সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি। আমি আবারও এ কথা জোর দিয়ে বলতে চাই, তার সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি। সেটা ছিল তার একটা মতামত এবং যার প্রেক্ষিতে আমি তাকে একটি প্রত্যুত্তর দিয়েছিলাম।

ইকোনমিস্ট : এমন একটি অভিজ্ঞতার পর আমার মনে হয় আপনি চিন্তা করবেন রিপোর্টে ভুল সংশোধনের জন্য কিছু আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া থাকা উচিত; কিন্তু এ ব্যাপারে আপনি আপনার বক্তব্যে বললেন, এটা তিন হাজার পৃষ্ঠার ডকুমেন্ট। সেখানে কোনো ভুল থাকবে না তা বিশ্বাস করা কঠিন। পরবর্তী প্রতিবেদন বের

হওয়ার আগে সর্বশেষ প্রতিবেদনের ভুল সংশোধনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া থাকা উচিত নয় কি?
রাজেন্দ্র পাচুরি : ঠিক বলেছেন। তবে আমার মনে হয়, ভবিষ্যতের রিপোর্টগুলোতে এ রকম কোনো ভুল আর হবে না, সেটা নিশ্চিত করাই আমাদের জন্য বেশি ভালো হবে।
ইকোনমিস্ট : পরবর্তী রিপোর্টে কোনো ভুল থাকবে না– আপনি কী মনে করেন এটা বাস্তবসম্মত লক্ষ্য?
রাজেন্দ্র পাচুরি : কেন নয়? আমি তো সে রকমই ভাবি। প্রতিবেদনটির পর্যালোচনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে দাবি উত্থাপন করা হয়েছে, আপনি জানেন, আমরা সেটা দিতে পারতাম না। বাস্তবতা হলো, চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরিতে যেসব লেখক কাজ করেছেন তারা সবাই এখন অন্য কাজ করছেন। ওই প্রতিবেদন পর্যালোচনা করতে তাদের আবার একত্র করার উপায় নেই। উপরন্তু আমরা এখন পঞ্চম মূল্যায়ন প্রতিবেদন নিয়ে কাজ করছি।

ইকোনমিস্ট: ভুল সংশোধনের বাস্তবসম্মত কোনো পন্থা থাকতে পারে– সেটা কি আপনি মনে করেন না? আমি 'নেচার' পত্রিকায় কাজ করতাম। সেখানে কোনো ভুলের ব্যাপারে কেউ দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সংশোধনী প্রকাশ করা হতো।
রাজেন্দ্র পাচুরি : অবশ্যই। বছর তিনেক আগে কোনো এক অনুষ্ঠানে আমরাও এমনটা করেছিলাম। একটা ফিগারে তিনটা শূন্য অতিরিক্ত যুক্ত হয়েছিল। আমরা তার সংশোধনী দিয়েছিলাম। কোথাও এ রকম কোনো ভুল হলে আমরা অবশ্যই সেটা করতে পারি।

ইকোনমিস্ট : এ রকম কোনো ভুল আইপিসিসির দৃষ্টিগোচরে আনার উপায় কি?
রাজেন্দ্র পাচুরি : সহ-সভাপতি অথবা আমার কাছে লিখলে ভালো হয়। অথবা আইপিসিসির এসব বিষয়ের জন্য যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের কাছে লিখলে। হতে পারে সেটা আইপিসিসি সেক্রেটারিয়েটের যে কেউ।

ইকোনমিস্ট : এখানে আরও কয়েকটা ইস্যুর উৎপত্তি হয়েছে। একটি হলো গ্রে লিটারেচার (যেসব তথ্য প্রচলিত উৎস থেকে পাওয়া যায় না); এ সম্পর্কে আইপিসিসির অবস্থান আপনি কি আমাকে স্পষ্ট করতে পারেন?
রাজেন্দ্র পাচুরি : এ সম্পর্কে আমাদের খুবই প্রচ্ছন্ন একটি প্রক্রিয়া রয়েছে। ওয়েবসাইটে এটা আছে এবং হিমবাহ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য সেখানে সুস্পষ্টভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশও দেওয়া আছে। যখন আমরা গ্রে লিটারেচার ব্যবহার করি, তখন তথ্যের উৎস আমাদের যাচাই-বাছাই

করতে হবে এবং তা কতটা সঠিক তার সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করা যেতে পারে। তাই কাজ করার সময় লেখককে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যখন আমরা গ্রে লিটারেচার থেকে কোনো কিছু ব্যবহার করি তখন তাদের নিশ্চিত করতে হবে তা পুরোপুরি সন্দেহাতীত। এ যাচাই প্রক্রিয়া সব লেখকের দ্বারাই নিয়মিতভাবে করা হয়েছে: কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এক্ষেত্রে সেটা ব্যর্থ হয়েছে।

ইকোনমিস্ট : অন্য সব ক্ষেত্রে যাচাই বাছাই করা হয়েছে এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত?

রাজেন্দ্র পাচুরি : হ্যাঁ। আমার সে রকম ভাবাই উচিত।

ইকোনমিস্ট : তাহলে এটা ঘটল কীভাবে?

রাজেন্দ্র পাচুরি : এটা একেবারেই অনিচ্ছাকৃত। দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গেই আমি বলতে পারি এটা বিরল ঘটনা।

ইকোনমিস্ট : আইপিসিসির পরবর্তী দিনগুলো সম্পর্কে আপনার কি কিছু বলার আছে? আপনি একই ব্যক্তি হয়ে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে স্বার্থের সংঘাত ঘটছে কি-না?

রাজেন্দ্র পাচুরি : আইপিসিসির সভাপতি হিসেবে যখন আমি নির্বাচিত হলাম, তখন আমাকে এক লাখ সুইডিশ ক্রোনার মঞ্জুর করা হলো, যাতে আমার নিজস্ব ইনস্টিটিউটের সুবিধা হয় এবং আমি আইপিসিসির কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারি। আমি বলতে চাচ্ছি, একজন ব্যক্তি হয়ে আমি দুটি পদে আছি। আইপিসিসি থেকে আমি কোনো বেতন নিতে পারি না। আমার ইনস্টিটিউট থেকে আমি বেতন পাই। আইপিসিসি গঠন করার আগে অনেক কিছু আমার ইনস্টিটিউটের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। এখানে স্বার্থের কোনো দ্বন্দ্ব দেখছি না। আইপিসিসির রিপোর্ট এখন জনসমক্ষে। এটা কোনো ব্যক্তির আয়ত্তাধীন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি) নয়। কাউকে কোনো উপদেশ দেওয়ার জন্য এখান থেকে যদি আমি তথ্য গ্রহণ করি, সেক্ষেত্রে আমি মনে করি না কোনো ধরনের দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। কেননা, এখান থেকে তো আমি নিজের জন্য একটি পয়সাও তৈরি করছি না। আর আমি তো আমার ইনস্টিটিউট থেকেই বেতন পাই। সম্মানীর পরিমাণ যাই হোক না কেন, তা তো আমি আমার ইনস্টিটিউট থেকেই পাই। ইন্টারেস্ট থেকে দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে– এর কোনো কারণ তো আমি দেখি না। জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার ডয়েচে ব্যাংক যা করতে পারে, সেটা করার জন্যই যদি আমি তাদের নির্দেশ দেই, তার অর্থ কি এই নয় যে, আমি আমার বিধিবদ্ধ কাজটিই করছি।

ইকোনমিস্ট : আইপিসিসির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করার জন্য কী কী প্রক্রিয়া রয়েছে?

রাজেন্দ্র পাচুরি : আমি মনে করি না আইপিসিসির এ রকম কোনো প্রক্রিয়া আছে। আসলে ব্যাপার হলো, এটা এমন একটা গ্রুপ যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সহমতের ভিত্তিতে। বিশ্বের সব দেশের সরকারের কাছে আমি দায়বদ্ধ। যদি এখানে ইন্টারেস্ট নিয়ে কোনো ধরনের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, আমি নিশ্চিত তাহলে রাষ্ট্রের সরকার অথবা অন্যরা বিষয়টি প্যানেলের মিটিংয়ে উপস্থাপন করবেন।

ইকোনমিস্ট : ইউএনইপি (জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি) ও ডব্লিউএমও (বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা) দুটিতেই স্বার্থ সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের আইন-কানুন রয়েছে। বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার সঙ্গে তুলনা করলেও কিছু বিষয় অদ্ভুত ঠেকে। আপনার সংগঠনেও এমন দ্বন্দ্ব রয়েছে; অথচ তা সমাধানের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া নেই। এ রকম কিছু থাকা উচিত নয় কি?

রাজেন্দ্র পাচুরি : ঠিক। ওই সংগঠন দুটি জাতিসংঘের অধীনস্থ সংস্থা। তাই সংগঠন দুটি জাতিসংঘের আইন-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; কিন্তু আপনি জানেন যে, আইপিসিসি জাতিসংঘের অধীনস্থ কোনো সংস্থা নয়। এটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠন। সে বিবেচনায় আমরা ইউএনইপি এবং ডব্লিউএমওসহ এ ধরনের অন্যান্য সংগঠন থেকে স্পষ্টতই আলাদা।

ইকোনমিস্ট : তার অর্থ কি এই যে, স্বার্থ সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য আইপিসিসির অফিসিয়াল কোনো নিয়ম-নীতি থাকার প্রয়োজন নেই?

রাজেন্দ্র পাচুরি : আমি মনে করি রাষ্ট্রগুলোই আইপিসিসি পরিচালনা করে এবং তারা মনে করে এ রকম কিছু থাকা উচিত। আমি নিশ্চিত যথাসময়ে সেটা করা হবে।

ইকোনমিস্ট : আপনি কি সেটাকে স্বাগত জানাবেন?

রাজেন্দ্র পাচুরি : অবশ্যই। আমার কোনো দ্বিধা নেই। আমি নিজেই নিজেকে বলি, এমন সুযোগ যদি আমার হতো!

ইকোনমিস্ট : স্যার, আপনার সেই সুযোগ তো ছিল?

রাজেন্দ্র পাচুরি : যদি নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের আমার কোনো দরকার না থাকে, তাহলে আমি সেটা কেন উত্থাপন করব? আমরা জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিজ্ঞানের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করছি। আপনাকে আমি বলেছিলাম আসলে এটা ছিল ব্যক্তিদের আচরণ এবং কার্যকলাপ। এ সম্পর্কে আপনাকে একটা উদাহরণ দিয়েছি যে, আমি আইপিসিসি থেকে অর্থ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছি। আমি আপনাকে এ সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা বলতে পারি। আশা

করি আপনি এ কথাগুলোও লিখবেন। আমি আইপিসিসির সভাপতি হওয়ার আগে আমার ইনস্টিটিউট আইপিসিসির ওয়েবসাইট ডেভেলপ করে। এটা করার জন্য আমাদের একটা বড় অঙ্কের অর্থ খরচ করতে হয়েছে। আইপিসিসির চেয়ারম্যান হওয়ার দিন আমি ঘোষণা করলাম যে, এখান থেকে আমি কোনো রকম বেতন গ্রহণ করব না। তখন আমার ইনস্টিটিউট আইপিসিসির ওয়েবসাইট দেখাশোনা এবং পরিচালনার জন্য নিজস্ব সম্পদ ব্যয় করতে শুরু করল।

আমার উপলব্ধি হলো, স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের অনুপস্থিতি ত্বরান্বিত করতে এবং মানদণ্ড নির্ধারণ করতে ব্যক্তিগত উদাহরণই সর্বোত্তম। তাই আমি কখনোই এ সবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিনি। যদি কেউ এটার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, তাহলে সে তা উত্থাপন করতে পারে। আমার আচরণ সম্পর্কে কেউ বিরূপ কথা বলতে পারবে না। চেয়ারম্যান হওয়ার মুহূর্ত থেকে আইপিসিসি থেকে যে রকম আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করতে আমি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলাম এবং আইপিসিসির ওয়েবসাইট পরিচালনার জন্য আমি প্রচুর সময় এবং প্রচেষ্টা ব্যয় করেছিলাম।

ইকোনমিস্ট : তথ্য এবং নীতি-নির্দেশনার মাঝে একটা লাইন অবশ্যই থাকতে হয়। আইপিসিসি গঠন করা হয়েছিল তথ্য সরবরাহ করতে যাতে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে নীতি প্রণয়ন করা যেতে পারে। তথ্য এবং নির্দেশনার মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কটা কি একটু পরিষ্কার করবেন?

রাজেন্দ্র পাচুরি : আমি সবসময় বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণের দিকে নজর দেই। আইপিসিসির চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে যা আমরা দিয়েছি এবং নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে তার ব্যাখ্যা করেছি। কখনোই আমি কাউকে বলিনি যে এ, বি, কিংবা সি এ রকম অপশনের মধ্য থেকে কোনো একটা অবশ্যই বাছাই করতে হবে; কিন্তু আমি সবর্দা একটি নির্দিষ্ট নীতি ও কার্যপদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছি। আমি মনে করি সেটাই আমার কাজ। কী ঘটতে পারে সেটাই আমরা জনগণকে দৃঢ়ভাবে বলতে চাই। যেমন, যদি আমরা কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের নির্গমন না কমাই, এর প্রভাব আফ্রিকায় কীভাবে পড়তে পারে, ক্ষুদ্র দ্বীপদেশগুলোতে কীভাবে পড়বে, আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এবং অন্য যে কোনো প্রান্তে কী ঘটতে পারে তা বলা। আর আমি সেটা করারই প্রত্যাশা করি।

আমি বলতে চাচ্ছি এটা নীতি প্রণয়নকারীদের জন্য। যাতে যে ব্যাপারে আমরা তথ্য দেই, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। নীতি সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইপিসিসি সম্ভবত প্রকাশ করবে।

নীতিগত দিকগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার বদলে আমি যদি শুধু বিজ্ঞান নিয়ে কথাবার্তা বলি তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমি নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারব না। আমি কখনও কাউকে বলি না যে, এটা কিংবা ওটা করেন। যা করা হয়েছে এর ফলে কী ঘটতে পারে এবং এটা না করা হলে কী ঘটতে পারে– আমি শুধু এ দুইয়ের মাঝে সংযোগ স্থাপন করি। আইপিসিসির প্রধান হিসেবে আমি মনে করি এটাই আমার বিধিবদ্ধ কাজ।

ইকোনমিস্ট : কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমনের সর্বোত্তম মাত্রা সম্পর্কে আপনি কী বলেন? এটা তো নীতি সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন, তাই নয় কি?

রাজেন্দ্র পাচুরি : আইপিসিসির চেয়ারম্যান হিসেবে আমি একবারই ৩৫০ পিপিএম (পার্টস পার মিলিয়ন, কিছু বিজ্ঞানী ও একটিভিস্ট কার্বন নির্গমনের কাঙ্ক্ষিত মাত্রা হিসেবে এটাকে ধরে থাকেন) মাত্রার কথা উল্লেখ বলেছিলাম। আইপিসিসির চেয়ারম্যান হিসেবে আমি বলতে পারি না যে, আমাদের ওই মাত্রা ফোকাস করা উচিত; আবার ব্যক্তিগতভাবে বলতেই পারি।

ইকোনমিস্ট : আপনি জানেন যে কিছু মানুষ আপনার পদত্যাগের ব্যাপারে কথা বলছে। কোনো পরিস্থিতিতে আপনার পদত্যাগ করা সঠিক হতে পারে?

রাজেন্দ্র পাচুরি : পঞ্চম মূল্যায়ন প্রতিবেদন শেষ করার পরই কেবল আমি পদত্যাগ করতে পারি। তখন বিষয়টি বিবেচনা করতে পারলেই আমি খুশি হব। আমি বলছি না যে, আমি এটাই করব। বলছি যে, এটাই আমার ভাবতে ভালো লাগবে। আমার দায়িত্ব আছে, জনসমর্থন আছে। পৃথিবীর সব দেশ আমাকে এ কাজটি করার জন্যই মনোনীত করেছে। আমার কাছে যারা এ বিশেষ উদ্দেশ্যটি সম্পন্ন করার প্রত্যাশা করেন, আমি তাদের পরিত্যাগ করতে চাচ্ছি না।

ইকোনমিস্ট : আপনি কি আশা করছেন যে, আইপিসিসির ওয়ার্কিং গ্রুপগুলোর মধ্যে এখন ভালো বোঝাপড়া রয়েছে?

রাজেন্দ্র পাচুরি : অবশ্যই। এখন টিমওয়ার্ক চলছে অভাবনীয়ভাবে। আগে কখনও এমনটি হয়নি। আমিও জানি যে, একই সঙ্গে আমিও কাজ শিখেছি। আমার মনে হয়, ওয়ার্কিং গ্রুপগুলোর মধ্যে এখন আরও বেশি মাত্রায় সমন্বয় সাধন করতে পারি।

ইকোনমিস্ট : আপনি কী মনে করেন পঞ্চম মূল্যায়ন প্রতিবেদন চতুর্থটির চেয়ে ভালো হবে?

রাজেন্দ্র পাচুরি : আমার সে রকম প্রত্যাশা করাই উচিত। আর তা করতে আমি সব রকম প্রচেষ্টাই করব।

দ্য ইকনোমিস্ট

ড. আইনুন নিশাত

আমাদের বিপুল জনসংখ্যা বিরাট ঝুঁকির মুখে থাকার বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে

পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়–বুয়েটের পানিসম্পদ প্রকৌশল বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন দীর্ঘদিন। বর্তমানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। গত বছর সেখানে যোগ দেয়ার আগে ১৯৯৮ সাল থেকে ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন ইউনিয়ন বা আইইউসিএন'র আবাসিক প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। পানিসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, জলাভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আইনুন নিশাত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। ন্যাশনাল ওয়াটার কাউন্সিল, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিষদ এবং ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনে সদস্য হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ফোরাম কিয়েটো প্রটোকলে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগকালীন 'স্টান্ডিং অর্ডার' প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণে মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করেছেন। কর্মজীবনে কিছুদিন পানি উন্নয়ন বোর্ডে ছিলেন। ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি বুয়েটের শিক্ষকতায় যোগ দেন। ১৯৮১ সালে তিনি স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোর স্ট্র্যাচলাইড ইউনিভার্সিটি থেকে নদীর গতি-প্রকৃতি বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

শেখ রোকন: কয়েকদিন আগে মেক্সিকোর কানকুনে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বৈশ্বিক সম্মেলন সমাপ্ত হল। এখন এর ফলাফল নিয়ে বিশ্লেষণ চলছে। আপনার মূল্যায়ন সংক্ষেপে জানতে চাই।

আইনুন নিশাত: আসলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ছাড়া কারিগরি আলোচনায় কোনো বড় ধরনের অগ্রগতি আশা করা যায় না। বিশ্বের ১৯৪ দেশের নানা পর্যায়ের প্রতিনিধিরা মেক্সিকোর উপকূলীয় শহরটিতে একত্র হয়েছিল বৈশ্বিক উষ্ণতারোধে একটি সমঝোতায় পৌঁছতে এবং এ ক্ষেত্রে এতদিন পর্যন্ত যে কাজ হয়েছে তার অগ্রগতি বিবেচনা করতে। দু'এক বাক্যে বলতে গেলে আমাকে বলতেই হবে যে, কানকুন সভায় মূলত কোপেনহেগেনের সিদ্ধান্তগুলোর স্বীকৃতি মিলেছে। ডেনমার্কে যেসব সিদ্ধান্ত না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে ছিল, মেক্সিকোতে সেগুলোকে সর্বজন স্বীকৃত ধারায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ সিদ্ধান্তই মূলত কোপেনহেগেনের ভাষায় লেখা, সেখানকার সিদ্ধান্তেরই এক ধরনের পুনরাবৃত্তি।

আরও সহজভাবে বললে, কানকুনে কোপেনহেগেনের সিদ্ধান্তগুলোকে কার্যত হালাল করা হয়েছে।

শেখ রোকন: আমরা জানি, কানকুনেরটি ছিল জলবায়ু বিষয়ক ১৬তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই ধরনের সভাগুলো কীভাবে আয়োজন হয়?

আইনুন নিশাত: বেশ, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক আলোচনা বা দরকষাকষি প্রক্রিয়া বুঝতে হলে এই কারিগরি দিকগুলো বোঝা জরুরি। এ ধরনের আয়োজনকে বলা হয় 'কপ' বা কনফারেন্স অব পার্টিজ। সেখানে আন্তর্জাতিক চুক্তি, আইন, কনভেনশন প্রটোকল স্বাক্ষরিত হওয়ার নির্ধারিত সময় পরপর স্বাক্ষরদানকারী সব দেশ একত্র হয়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা করে ধারাগুলোর পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। বস্তুত জলবায়ু বিষয়ক আলোচনা একটি ধারাবাহিকতার প্রক্রিয়া। বোধকরি এটি শুরু হয়েছিল ১৯৮৮ সালে। সেবার আইপিসিসি বা আন্তঃদেশীয় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্যানেল গঠিত হয়। বিশ্বের সব দেশের সদস্য, মূলত বিজ্ঞানীরা নিজ নিজ দেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন। বাংলাদেশ আইপিসিসির সক্রিয় সদস্য। আমরা জানি, আইপিসিসি ২০০৭ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন বাংলাদেশি বিজ্ঞানীও নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির সার্টিফিকেট পেয়েছেন। শীর্ষস্থানীয় এসব বিজ্ঞানীর প্রথম প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৯২ সালে ইউএন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ চূড়ান্ত হয়। এর মাধ্যমে সব দেশ মেনে নিয়েছিল, বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। ১৯৯২-তে কনভেনশন স্বাক্ষর হওয়ার পর প্রথম 'কপ' অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৫-তে। সেখানে চাপ সৃষ্টি করা হলো প্রশমনের ব্যাপারে উন্নত দেশগুলো যাতে দায়িত্বশীল পদক্ষেপ নেয়। এর ফলে মাত্র দু'বছরের মধ্যে কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয় কপ-৩-এ। কিয়োটো প্রটোকলে বলা হলো উন্নত দেশগুলো কীভাবে গ্রিনহাউস গ্যাস কমাবে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো কীভাবে এটা থেকে লাভবান হতে পারে। কিয়োটো প্রটোকল হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র আন্তর্জাতিক চুক্তি, যেটা লিগ্যালি বাইন্ডিং, অর্থাৎ এটার আইনগত প্রায়োগিক ক্ষমতা রয়েছে।

শেখ রোকন: কোন দেশগুলো গ্রিনহাউজ গ্যাস উদ্গীরণের জন্য দায়ী, সেটা কীভাবে নির্ধারিত হয়েছিল?

আইনুন নিশাত: ১৯৯২ সালের কনভেনশনেই তার একটা তালিকা করা হয়েছিল। এতে ৩৭টি দেশ স্থান পায়। কিয়োটো প্রটোকল অনুযায়ী এই দায়িত্ব দেশগুলো মেনে নেয় যে, ১৯৯০ সালের পর্যায় থেকে গড়ে পাঁচ ভাগের মতো গ্রিনহাউস গ্যাস উদ্গিরণ কমানো হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বে পড়ে সাত ভাগ কমানোর। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এটা মেনে নেন। কিন্তু চুক্তিটি কার্যকর করার আগেই তাকে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। এ অবস্থায় কিয়োটো প্রটোকলটি কার্যকর করতে গেলে যতগুলো দেশ এবং

গ্রিনহাউস গ্যাস উদ্গিরণকারীর সমর্থন পাওয়া প্রয়োজন, সেটা পাওয়া দুষ্কর হচ্ছিল। তারপরও ২০০৫ সালে কিয়োটো প্রটোকল কার্যকর হলো। এবং ২০০৫ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে উন্নত দেশগুলো সবাই মিলে পাঁচ ভাগের মতো গ্রিনহাউস গ্যাস কমাবে, এটা নির্ধারিত হয়। সে সঙ্গে বলা হয়, ২০১২-তে গিয়ে পরবর্তী ধাপ নির্ধারণ করা হবে। এই পরবর্তী ধাপের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি অ্যাডহক ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের অগ্রগতি আলোচনার জন্য কনফারেন্স অব পার্টির সঙ্গে সঙ্গে কিয়োটো প্রটোকলের অগ্রগতি আলোচনার জন্য মিটিং অব পার্টিজ শুরু হয়। এ পর্যায়ে আমরা ২০০৭ সালে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে কপ-১৩ তে মিলিত হই।

শেখ রোকন: বলা হয়ে থাকে যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বৈশ্বিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে ১৩তম সভা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর একটি কারণ হতে পারে, ওই সভার আগে আগে আইপিসিসি তার চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। আর কোনও কারণ কি আছে?

আইনুন নিশাত: হ্যাঁ, আছে। বালিতে প্রথম ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের একটি রূপরেখা প্রণীত হয়েছিল। অবশ্য বালি অ্যাকশন প্ল্যান গৃহীত হয়েছিল তীব্র বাদানুবাদের পর। সেখানে যে পাঁচটি বিল্ডিং ব্লক বা বড় বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তার প্রথমটিকে আমরা বলি শেয়ারড ভিশন, অর্থাৎ ভবিষ্যতের দুনিয়াটাকে আমরা কী দেখতে চাই। দ্বিতীয় ব্লকে আছে মিটিগেশন। এ ক্ষেত্রে বলা হয় প্রশমনের দায়িত্ব পৃথিবীর সব দেশের। উন্নত দেশগুলো তা করবে বাধ্যতামূলকভাবে। উন্নয়নশীল দেশগুলো তা স্বেচ্ছায় করবে। আর অনুন্নত দেশগুলোকে ছাড় দেওয়া হয়। এর সঙ্গে বলা হয়, দেশ যেভাবেই প্রশমন করুক না কেন, তা হতে হবে পরিমাপযোগ্য, প্রকাশযোগ্য এবং যাচাইযোগ্য। তৃতীয় ব্লকে বলা হয় অভিযোজন বা অ্যাডাপ্টেশন। এখানে দেশগুলোর কে কতটা ঝুঁকিতে আছে তা নির্ণয় করতে হবে, অ্যাডাপ্টেশনের প্রক্রিয়াটা ঠিক করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে নতুন কিছু আইডিয়া যেমন– ইন্স্যুরেন্সের প্রচলন করতে হবে। চতুর্থ ভাগে রয়েছে অর্থায়নের বিষয়টি। প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, সেটা কীভাবে হবে, কে দেবে, কীভাবে ব্যবহার হবে ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে বলা হয়। শেষ বা পঞ্চম ভাগে রয়েছে প্রযুক্তির ব্যবহার ও এর হস্তান্তর। আমরা যদি গ্রিনহাউস গ্যাস কমাতে চাই, অর্থাৎ প্রশমনের পথে হাঁটতে চাই তাহলে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসে যেতে হবে। এই পাঁচটি বিল্ডিং ব্লক নিয়ে আলোচনাটা শুরু করে আরেকটা অ্যাডহক ওয়ার্কিং গ্রুপ। এটির নাম হচ্ছে অ্যাডহক ওয়ার্কিং গ্রুপ অন লং টার্ম কো-অপারেশন। একদিকে কিয়োটো প্রটোকলের ২০১২ সালের পর কী হবে, তার ধারা নির্ধারণ, অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার ধারা নিয়ে আলোচনা। বালি অ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে ব্যাংকক, বন, আগ্রা, বার্সেলোনাসহ বিভিন্ন স্থানে মিটিং ও পোজনানে কর্মশালা টাইপের আলোচনা শুরু হয়। পরবর্তী দু'বছরে ৯-১০টি আন্তর্জাতিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। চূড়ান্ত মিটিং হয় ২০০৯-এ

কোপেনহেগেনে। স্থির হয়েছিল, ১৫তম সভায় বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে।

শেখ রোকন: কিন্তু ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত ১৫তম সভার ইতিহাস তো হতাশার। সারা বিশ্ব হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছিল।

আইনুন নিশাত: কোপেনহেগেনে দীর্ঘ আলোচনার পর যেসব সিদ্ধান্ত প্রণীত হয়েছিল, সেগুলোকে কেউ একোর্ড, কেউ অঙ্গীকারনামা বা কেউ কোপেনহেগেন চুক্তিও বলে থাকেন। যে নামেই ডাকা হোক না কেন, নির্লিপ্তভাবে দেখলে এসব সিদ্ধান্ত, আমার মতে অত্যন্ত চমৎকার ও সুদূরপ্রসারী ছিল। কিন্তু এসব সিদ্ধান্ত প্রণীত হয়েছিল ২৫/২৬টি দেশের মধ্যে রুদ্ধদ্বার আলোচনার মাধ্যমে। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ইনক্লুসিভ ও ট্রান্সপারেন্ট হয়নি। কেবল এ 'অপরাধে' বাকি বিশ্ব চুক্তিকে গ্রহণ করতে পারেনি। কোপেনহেগেন চুক্তিটি একেবারে বাতিল হওয়ার পথে যাচ্ছিল। শেষ মুহূর্তে কোনরকমে এটির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা হয়; কিন্তু কার্যত এটিকে গ্রহণ করা হয়নি।

কোপেনহেগেনের ব্যর্থতার পেছনে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক হুসেন ওবামার অবিমৃশ্যকারিতা। কোপেনহেগন চুক্তি প্রণয়নে তিনি ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন; কিন্তু রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পুরোপুরি একদিকে ঠেলে দেওয়ার কারণে তা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। তার সঙ্গে বোধহয় যোগ হয়েছিল ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীর নির্বুদ্ধিতা। তিনি ভেবেছিলেন, গায়ের জোরে সবাইকে সবকিছু মানিয়ে ফেলতে পারবেন। আমার মনে আছে, ২০০৯ সালের ১৮ ডিসেম্বরের চূড়ান্ত অধিবেশনে রাত ৩টায় সম্মেলনকক্ষে যখন কোপেনহেগেন চুক্তি উপস্থাপিত হয়েছিল তার আগের চার রাত না ঘুমানো ক্লান্ত প্রতিনিধিদের একাংশ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। অধিবেশন কক্ষের ভেতরে এবং বাইরে, বলতে গেলে বিশ্বজুড়েই শুরু হয় নানা নেতিবাচক কথা-বার্তা। ফলে কোপেনহেগেন চুক্তিটি ভালো দলিল হয়েও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কোপেনহেগেনে যদিও বলা হয়েছিল, এই চুক্তি দিয়ে প্রাথমিক কিছু কাজ করা যাবে; কিন্তু কার্যত পরবর্তী বছর পুরো প্রক্রিয়া থমকে ছিল।

শেখ রোকন: একই ধরনের সভা, একই ধরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও কানকুন সম্মেলনকে তাহলে সফল বলা হচ্ছে কেন?

আইনুন নিশাত: একটি কারণ কানকুনের সভা নিয়ে আশাবাদ কম ছিল। কোপেনহেগেন সভার ব্যর্থতা লক্ষ্য করে ১৬তম সভার জন্য আলোচকরাও একটু সাবধানী অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে কানুকনে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব

হয়েছে। বড় কথা, যেহেতু খুব বেশি প্রত্যাশা ছিল না; যতটুকু সম্ভব হয়েছে সেটাকেই সবাই বিরাট অর্জন বলে মনে করছেন।

এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভালো, বৈশ্বিক উষ্ণতা বিষয়ক আলোচনায় সব সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হতে হয়। তারপর আরও দুটি গুণগত মান অর্জন করতে হয়। প্রথমটি হচ্ছে আলোচনা 'ইনক্লুসিভ' বা সব সদস্যের স্বাধীন মত প্রকাশ নিশ্চিত করে সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে হতে হবে। দ্বিতীয়ত 'ট্রান্সপারেন্ট' বা আলোচনা প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি স্বচ্ছতা থাকতে হবে এবং কারও ওপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার কোনো প্রচেষ্টা থাকবে না। ১৯৪টি দেশ এক সঙ্গে কথা বললে কোনো দিনই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না। এ জন্য প্রথমে সিদ্ধান্ত হয় দল বা গোষ্ঠীভিত্তিক। তারপর এক এক গোষ্ঠীর একজন করে মুখপাত্রের মাধ্যমে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু গোষ্ঠীর আলোচনার সময় গোষ্ঠীভুক্ত সব দেশের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয় এবং সব দেশকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়। গোষ্ঠী পর্যায়ে আলোচনার সময় আলোচ্য সূচির প্রতিটি বিষয়ে মুখপাত্র নির্বাচন করা হয়। এরপর যখন সব দেশ মিলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করা হয় তখন এ মুখপাত্ররা আলোচনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ায় সব দেশের বক্তব্যকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের দেশ নি উই, যার জনসংখ্যা দেড় হাজার। সেটি বক্তব্য রাখার জন্য যতটুকু সুযোগ পাবে ঠিক ততটুকু পায় শক্তিধর চীন, ভারত কিংবা জাপান। তবে, বলা বাহুল্য, বিশ্বের রাজনীতির মঞ্চে অবশ্যই সব দেশ সমান ওজন বহন করে না। কানকুনে আমরা দেখেছি, মেক্সিকোর নেতারা গোড়া থেকেই 'ইনক্লুসিভনেস' ও 'ট্রান্সপারেন্সি' নিয়ে সজাগ ছিলেন। তারা আলোচনার ধারাকে রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড বা ফলাফলমুখী ধারায় পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শেখ রোকন: জলবায়ু বিষয়ক প্রায় প্রত্যেক সভায় আমরা প্রশমন নিয়ে কথা হতে দেখি। কিন্তু ঐকমত্য হয় না কেন?

আইনুন নিশাত: কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ শেষে, ২০১২ সালের পর প্রশমনের লক্ষ্যমাত্রা এখন নির্ধারণ করতে না পারার প্রথম জটিলতা হচ্ছে ওই চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল না। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অগ্রগামী চীন, ভারত, সাউথ আফ্রিকা, ব্রাজিল, মালয়েশিয়া, মেক্সিকোও নেই। এদের না থাকায় হিসাবভেদে যারা কিয়োটো প্রটোকল অনুসরণ করছে, তারা সবাই মিলে শতকরা ২৭ থেকে ৩০ ভাগ গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপাদন করে। এই দেশগুলো বলছে, ৭০ ভাগ গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপাদনকারী কোনো দায়িত্ব না নিলে আমরা কেন নেব? কিন্তু চীন, ভারত ও সাউথ আফ্রিকার যুক্তি হচ্ছে, ১৯৯২-তেই তো নির্দিষ্ট হয়েছে যে, এ দায়িত্বটা হচ্ছে উন্নত দেশের। আমাদের তো উন্নতি করতে হবে। আর সেটা করতে গেলে শিল্পায়ন করতে হবে।

প্রশমনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় জটিলতাটা হচ্ছে বেজ ইয়ারটা কোনটি? ১৯৯২-তে স্বীকৃত হয়েছিল যে, বেজ ইয়ার হবে ১৯৯০। আমরা কোপেনহেগেনে লক্ষ্য করেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেজ ইয়ারটাকে শিফট করে ২০০৫ নিতে চেষ্টা করেছে। একই কাজ ভারত ও চীনও করেছিল। কিন্তু কানকুনে আমরা দেখলাম ভারত এবং চীন এ ক্ষেত্রে অনেক নমনীয় অবস্থান নিল এবং তারা ১৯৯০-তে ফিরে গেল। মিটিগেশনের ক্ষেত্রে পরের জটিলতা হচ্ছে, বর্তমানের যে ধারায় পৃথিবী চলছে তাতে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। ১৮৫০ কিংবা সেই সময়ে বিশ্বে বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ ছিল ২৮০ পিপিএম (পার্টস পার মিলিয়ন)। যেটা বেড়ে এখন ৩৮৫/৩৯০ পিপিএমের কাছাকাছি হয়ে গেছে। আমরা যদি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ না নিই, তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই এটা ৪০০ পার হয়ে ৪৫০ বা ৫০০ পিপিএমে চলে যাবে। এবং তাহলে বৈশ্বিক উষ্ণতা দুই ডিগ্রি তো দূরের কথা, এটা সাড়ে তিন বা চার ডিগ্রিতে পৌঁছে যেতে পারে। এমন প্রেক্ষাপটে আমরা চাচ্ছি যে, প্রশমনের ধারাটি এমন হবে যাতে ২০১৭-এর পরে এটা আর যেন না বাড়ে। বরং এটা সম্মিলিতভাবে যেন ঋণাত্মক ধারায় প্রবাহিত হয়। শেষ পর্যন্ত সবাই মোটামুটি ২০২০-এর পর আর গ্রিনহাউস বাড়বে না, এমন একটা অঙ্গীকারে পৌঁছেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, সম্মিলিতভাবে আমরা কতটা কমাব? এ ক্ষেত্রেও জটিলতা আছে। গ্রিনহাউস গ্যাসগুলোকে কমিয়ে ৩৫০ পিপিএমে নিয়ে আসতে হবে। এ শতাব্দীর শেষভাগে যদি এ লক্ষ্যে পৌঁছতে হয় তবে ২০২০-এর মধ্যে অন্তত পক্ষে ৪৫ এবং ২০৫০-এর মধ্যে অন্তত পক্ষে ৯০ ভাগ কমাতে হবে। এ ক্ষেত্রে কিছু কিছু দেশ ৪০ ভাগ কমাতে রাজি হয়েছে। যাদের মধ্যে প্রধান হলো নরওয়ে ও যুক্তরাজ্য। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য দেশ ৩০ ভাগ কমাতে রাজি আছে। এবং তারা বলছে যে, উন্নয়ন দেশগুলোর মধ্যে অগ্রসর দেশগুলো যদি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে তাহলে সম্মিলিতভাবে তারা ৪০ ভাগ কমাতে আগ্রহী হবে। আর ২০৫০ সালের মধ্যে তারা ৮০ ভাগ কমাতে রাজি আছে। আমরা বলছি, ৯০ ভাগ কমাতে হবে।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রশমনই তো সবচেয়ে জরুরি। অথচ এ ক্ষেত্রেই এত জটিলতা। আশাবাদের কোনও বিষয় আছে কি?

আইনুন নিশাত: প্রশমনের ক্ষেত্রে অন্য দিক দিয়ে দুনিয়া কিছুটা এগোনোর চেষ্টা করছে। যেটাকে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে রেড (রিডাকশন অব এমিশনস ফ্রম ফরেস্ট বাই এভোয়ডিং ডিগ্রেডেশন এন্ড ডিফরেস্টেশন) এবং রেড প্লাস। রেড হচ্ছে বনাঞ্চলকে অবক্ষয় রোধ করে এবং বনাঞ্চল ধ্বংস হওয়ার কাজটাকে সংযত করে, অর্থাৎ নতুন বন সৃজন করে এবং বর্তমানের বনকে রক্ষা করে কার্বন ডাই-অক্সাইড ধরে রাখার ব্যবস্থা। যত বেশি বনায়ন করা যাবে তত বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড ধরা যাবে। আর রেড প্লাস হচ্ছে এর সঙ্গে জীববৈচিত্র্য বিষয়ক চিন্তা ভাবনা অন্তর্ভুক্ত করা। অর্থাৎ প্রতিবেশ বিবেচনা করা।

সারা দুনিয়া চাচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় প্রশমনের বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে। এ ক্ষেত্রে কিয়োটো প্রটোকল একমাত্র রক্ষাকবচ। কোনোমতেই এটাকে বাতিল বা অকার্যকর করা যাবে না; বরং এটাকে ধরে রেখে কনভেনশনের অধীনে কিয়োটো প্রটোকলের অর্জনটাকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া। এটার ক্ষেত্রে এ মুহূর্তে সবচেয়ে বিরোধিতা করছে জাপান। এবং জাপানের সঙ্গে সায় দিচ্ছে বলা যেতে পারে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ আরও কিছু উন্নত দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথায় মনে হয়, তারা প্রশমনের ক্ষেত্রে সিরিয়াসলি কাজটা হাতে নিতে চায়। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এটি নেতিবাচকভাবে দেখা হচ্ছে। মুখে এগিয়ে নেওয়ার কথা বললেও প্রশমনের ক্ষেত্রে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যাপারে তারা খুব দুর্বল অবস্থানে আছেন।

শেখ রোকন: সার্বিকভাবে আইনগত বাধ্যবাধকতামূলক চুক্তির কী হবে? কানকুন যদিও কোপেনহেগেনের মতো ব্যর্থতা নেই, আইনগত দিক থেকে বাধ্যতামূলক চুক্তি পাওয়া যায়নি। এটা কবে নাগাদ সম্ভব হতে পারে?

আইনুন নিশাত: পরের সভা হবে এ বছরের ডিসেম্বরে ডারবানে। তার পরের সভা হবে ২০১২ সালের ডিসেম্বরে, অনুমান করছি কাতারের রাজধানী দোহায়। এর পরের সভা হবে ২০১৩-এর ডিসেম্বরে। এবং প্রতি বছর ডিসেম্বরে কনফারেন্স অব পার্টিজ হতে থাকবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি, ২০১১ বা ২০১২ সালেও দুই-তিনটি কারণে হয়তো লিগ্যালি বাইন্ডিং ডকুমেন্ট হবে না। প্রথম কারণ হচ্ছে পৃথিবীর অনেক দেশ লিগ্যালি বাইন্ডিং ডকুমেন্টে সই করতে গেলে তাদের আইনসভার অনুমতি নিতে হয়। আমি দেখছি না যে, এ মুহূর্তে ভারতের আইনসভা কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা এ ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত আছে। কাজেই এ ব্যাপারে প্রত্যেকটি দেশের ভেতরে দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটাকে প্রভাবিত না করে এ লক্ষ্য অর্জিত হবে না। আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি, কানকুনে ভারত এ ব্যাপারে তীব্র বিরোধিতা করেছিল। এ বিরোধিতাটি তাদের নিজ দেশের শাসনপ্রণালির কিছু ব্যবস্থাপনার কারণে করতে হয়েছে। অন্যথায় আমি বিশ্বাস করি, ভারতও চায় প্রশমনের বিষয়টি বাধ্যতামূলকভাবেই হোক। কীভাবে এর আইনগত চেহারা কী হবে, এটা নিয়ে আলোচনা কেবল শুরু হয়েছে। কানকুন মিটিংয়ের আগে মিটিং হয়েছিল চীনের তিয়ানঝিন শহরে, তার আগের মিটিং হয়েছিল জার্মানির বন শহরে আগস্ট-সেপ্টেম্বরে। তখনই এ আইনগত বিষয়ে প্রথম দৃষ্টি দেওয়া হয়। অর্থাৎ এ বিষয়ে আরও কিছুটা সময় লাগবে।

শেখ রোকন: আইনগত বাধ্যতামূলক চুক্তি না হলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত অর্থায়নও বোধহয় সম্ভব নয়। অথচ বাংলাদেশের মতো যেসব দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ঝুঁকিতে রয়েছে, তাদের জন্য অর্থায়নই সবচেয়ে জরুরি। এ ব্যাপারে আলোকপাত করুন।

আইনুন নিশাত: জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য যে বৈশ্বিক উদ্যোগ ও প্রস্তুতি আমরা দেখছি, সম্ভবত তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অথচ সবচেয়ে জটিল ইস্যু হচ্ছে অর্থায়ন। তবে কানকুনে এ ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। বলা হচ্ছে, উন্নত দেশগুলো তিন বছরের জন্য সর্বমোট ৩০ বিলিয়ন ডলার জমা করবে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দেবে। এই অর্থের পরিমাণ বেড়ে ২০২০ সালে প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়াবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া নিয়ে কয়েকটা কথা আছে। প্রথমত, বর্তমানে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য উন্নত বিশ্ব কিংবা বিশ্বব্যাংক, এডিবির মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যে অর্থায়ন করে, এই অর্থ তার অতিরিক্ত হতে হবে। দ্বিতীয়ত, এই অর্থ দ্রুত ছাড় করতে হবে এবং গ্রহীতাদের কাছে যেন সহজলভ্য হয়।

উন্নত বিশ্ব অবশ্য ইতিমধ্যেই বলেছে তারা অর্থ ছাড় করবে। আমি একটি হিসাবে দেখেছি, উন্নত বিশ্ব কানকুনে যে অঙ্গীকার করেছে তা একত্র করলে প্রায় ৩২ বিলিয়ন ডলার হয়ে যাবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই অর্থ কি এর আগে অঙ্গীকারকৃত উন্নয়ন সহায়তার অতিরিক্ত? এখানে আমার সন্দেহ আছে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, উন্নয়ন সহায়তার অর্থই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের তহবিলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে তো আমাদের খুব একটা লাভ হচ্ছে না। তবে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড নামে একটি তহবিল তৈরি হচ্ছে। অনুমান করছি অতিরিক্ত ১০০ বিলিয়ন ডলার এখানে জমা হবে। যদিও অর্থের পরিমাণ এখনও উল্লেখ করা হয়নি, দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের ক্ষেত্রে ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে বলে স্বীকার করা হয়েছে। তাহলে অর্থায়নের ক্ষেত্রে আমরা তিনটি তহবিল পাচ্ছি– স্বল্পমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি এবং গ্রিন ফান্ড।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক তহবিলের ব্যবস্থাপনা নিয়েও বোধহয় ঐকমত্যের অভাব রয়েছে।

আইনুন নিশাত: এ বিষয়ে তর্ক চলছে। উন্নত বিশ্ব চায় জিইএফ (গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফেসিলিটি) ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে কাজটি হোক। কিন্তু এক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত। বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় আমাদের অভিজ্ঞতাও অত্যন্ত তিক্ত। যে কারণে সব উন্নয়নশীল দেশ একজোট হয়েছিল যে তারা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তহবিল ব্যবস্থাপনায় বিশ্বব্যাংককে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু পরে দেখা গেল চীন সরে গেছে, তাদের খুব একটা আপত্তি নেই। এর কারণ বিশ্বব্যাংক চীনের সঙ্গে কখনও উল্টাপাল্টা আচরণ করে না। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তহবিলের ব্যাপারে দীর্ঘ

আলোচনা, অনেক বাদানুবাদ ও বহু তিক্ততার পর শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে, বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা থাকবে কেবল অর্থ ব্যবস্থাপনায়। কে কে অর্থ পাবে, কোন প্রকল্পে অর্থ পাওয়া যাবে– এসব বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা থাকবে না। উন্নত দেশের এক প্রতিনিধি কানকুনে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বিশ্বব্যাংকের ব্যাপারে তোমরা নেতিবাচক কেন? তাকে বলেছিলাম, বৈশ্বিক উষ্ণতা মোকাবেলার কাজে অর্থায়ন হতে হবে অনুদানমূলক। কিন্তু বিশ্বব্যাংক মুনাফার জন্য পরিচালিত। এটা সুদের বিনিময়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন করে থাকে। আর অনুদানের অর্থ তো ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন নেই। গ্রহীতা দেশ যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে ব্যবহার করবে। বলা বাহুল্য, বিদেশি ওই প্রতিনিধি আমার কথায় সন্তুষ্ট হননি।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বৈশ্বিক তহবিলে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকার ব্যাপারে বাংলাদেশের অবস্থান কী?

আইনুন নিশাত: আমাদের পাট খাতে বিশ্বব্যাংকসহ দাতাগোষ্ঠীর ব্যবহার আমরা সহজে ভুলতে পারি না। সেক্টরটাকে তারা মেরেই ফেলেছে। রেলওয়েকেও মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। অথচ রেলওয়ে হচ্ছে পরিবেশগতভাবে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য যোগাযোগমাধ্যম। অনেক সময় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্পে ঋণ নিতে গেলে তারা দিয়ে দেয় ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত শর্ত। আমি অত্যন্ত গর্বিত যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে পরিষ্কারভাবে বলেছেন– জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থ সরাসরি রাষ্ট্রগুলোর কাছে আসতে হবে। বস্তুত বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা সীমাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অভ্যন্তরীনভাবেও বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে নিজস্ব অর্থায়নে ২০০ মিলিয়ন ডলার বা ১৪০০ কোটি টাকার তহবিল সৃষ্টি করেছে। এর বাইরে এখন পর্যন্ত দাতা দেশগুলো অতিরিক্ত ৭০০-৮০০ কোটি টাকা দ্বিপাক্ষিক অনুদান হিসেবে জমা করেছে। এই অর্থ একটি আলাদা তহবিলে রাখা হচ্ছে। সেটার দায়িত্ব দাতারা বিশ্বব্যাংকের হাতে অর্পণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমাদের সরকার কেবল ফান্ড ব্যবস্থাপনা ছাড়া প্রকল্প নির্বাচনে বিশ্বব্যাংকে কোনো ভূমিকা দিতে রাজি হয়নি। বাংলাদেশ সরকার যে সিদ্ধান্ত ২০১০ সালের প্রথমদিকে নিতে পেরেছিল, সেটাই গোটা বিশ্ব অনুসরণ করল ওই বছরের ডিসেম্বরে কানকুনে।

শেখ রোকন: তার মানে, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক অর্থায়ন প্রক্রিয়া কি বিশ্বব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে?

আইনুন নিশাত: কানকুনে সিদ্ধান্ত হয়েছে, বিশ্বব্যাংক কেবল ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করবে। সে দায়িত্বও অন্তর্বর্তীকালীন। তিন বছর তাদের কাজ দেখা হবে তারপরে সিদ্ধান্ত হবে কারা কাজটি চূড়ান্তভাবে করবেন। তাহলে আগামী তিন বছরে যে ৩০ বিলিয়ন ডলার পাওয়া যাবে তার ব্যবস্থাপনা কী হবে? উন্নত বিশ্ব দেখছে যে

যেহেতু বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা নিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো সন্দিহান, সেহেতু তারা এই অর্থের একটা বড় অংশ দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন এজেন্সির হাতে থাকবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করা হবে। তারা ফাইন্যান্সিয়াল মেকানিজম প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করবেন এবং তাদের তত্ত্বাবধানেই কাজটা হবে। ৪০ সদস্যবিশিষ্ট একটি ট্রানজিশনাল কমিটির মাধ্যমে কাজ চলতে থাকবে। পরবর্তী সময়ে অ্যাডাপ্টেশন ফান্ড বোর্ড হয়ে গেলে তার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অর্থাৎ সব দেশ এখন মোটামুটি রাজি হয়েছে, অর্থায়ন, অর্থ ব্যবস্থাপনা, বিতরণ প্রক্রিয়া– পুরো বিষয়টি সবাই মিলে ঠিক করবে। শুধু বিশ্বব্যাংকের মতো একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকবে না।

আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি সামান্য মনে হতে পারে। কিন্তু এর পেছনে প্রচুর কথা খরচ হয়েছে, প্রচুর চাপ উপেক্ষা করা হয়েছে। অন্যথায় বিশ্বব্যাংক খুব সহজে মেনে নেওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমি মনে করি চাপ অব্যাহত থাকবে। বহু উন্নয়নশীল দেশ সে চাপের কাছে যে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হতে পারে বলে আমার ভয়ও রয়েছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার অনুন্নত অনেক দেশই তাদের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ। কাজেই জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলের ব্যাপারে আপাতত বিশ্বব্যাংকের হাত থেকে রেহাই মিললেও ভবিষ্যতে কী হবে জানি না। ট্রানজিশনাল কমিটিতে বাংলাদেশও রয়েছে, সেখানে যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখা দরকার।

শেখ রোকন: অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তহবিল ব্যবস্থাপানায় বিশ্বব্যাংকের চাপ কতদিন মোকাবেলা করা যাবে?

আইনুন নিশাত: ভয় অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও রয়েছে। আমাদের একটা বড় দুর্বলতা হচ্ছে ক্যাপাসিটি। বাংলাদেশের মতো দেশের কতটা ক্যাপাসিটি আছে যে সারা দুনিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক তহবিল থেকে লাভবান হতে পারবে? খুব একটা নেই। আমাদের দেশে ক্যাপাবল লোকের অভাব রয়েছে, রয়েছে প্রস্তুতির অভাব। আমরা এখনও দাতানির্ভর দেশ। তবে আশার কথা, পরিবর্তন শুরু হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে দেখছি সরকার মোটামুটি বলতে চায়, আমরা কী করতে চাই। ৩০-৪০ বছর আগে আমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ৬০ থেকে ৮০ ভাগ অর্থ আসত দাতাদের কাছ থেকে। এখন তো বোধ করি এটা ১০ ভাগেরও কম। আমি তো মনে করি, সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত বড় বড় প্রকল্প ছাড়া, এক হাজার কোটি টাকার নিচে আমরা দাতার কাছ থেকে সহায়তা নেব না। বড় কিংবা জটিল প্রকল্পে উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়, সেটা আমরা দাতাদের কাছ থেকে নিতে পারি।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বৈশ্বিক তহবিলে নিজেদের অংশ নিশ্চিত করতে আমাদের তাহলে কী করতে হবে?

আইনুন নিশাত: সারাবিশ্বেই তর্ক-বিতর্ক চলছে যে কার বেশি অর্থানুকূল্য পাওয়া উচিত। আমরা বলছি, যে দেশ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তাদেরই অর্থানুকূল্যটা বেশি পাওয়া উচিত। কিন্তু এরপর কে কার থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তার একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। কানকুনে একটা রসিকতা দেখেছি। বলা হচ্ছিল যে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হওয়ার একটা বিউটি কন্টেস্ট শুরু হয়েছে। এখন বিভিন্ন বিবেচনায় বাংলাদেশ কিংবা নেপাল কিংবা ভারত কিংবা পাকিস্তান এরা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। সার্বিক দৃষ্টিতে কোনো কোনো হিসাবে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। ব্যক্তিগতভাবে আমি সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এই কথার ওপর জোর দিয়ে অন্যদের সঙ্গে ঝামেলা বাধাতে চাই না। বলতে পারি, সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে আমরা অন্যতম। আমাদের মোকাবেলার ক্ষমতা কম। অর্থাৎ অর্থানুকূল্যে আমাদের দাবিটা বেশি এবং এই লক্ষ্যে আরও যদি দশটি দেশ অতি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে অর্থানুকূল্য পায় তাতে আমাদের আপত্তি নেই। বাংলাদেশের যেটা করতে হবে তা হলো আমাদের বিপুল জনসংখ্যা যে বিরাট ঝুঁকির মুখে আছে সে বিষয়টিকে তুলে ধরতে হবে। আমাদের ভালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্টটা সঠিকভাবে করে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে হবে।

শেখ রোকন: প্রশমন, অভিযোজন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে আমরা কী করতে পারি?

আইনুন নিশাত: বাংলাদেশের জন্য অভিযোজন অত্যন্ত জরুরি। আইলা কিংবা সিডর দুর্গতদের এখনও আমরা বাড়ি ফিরিয়ে দিতে পারিনি। অর্থাৎ ভাঙা বাঁধগুলোকে মেরামত করতে পারিনি। আমাদের ২০০৯ সালে প্রণীত বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্লানে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি সেক্টরে কী কাজ করতে হবে সেটা চিহ্নিত করা আছে। এই কর্মসূচিটিকে যদি আমরা প্রকল্পে কনভার্ট করে অ্যাকশন প্লানে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে কিন্তু উন্নত বিশ্ব থেকে প্রযুক্তি তথা আর্থিক সহযোগিতা পেতে পারি।

প্রযুক্তিগত কিছু উন্নয়নের বিষয়েও জোর দিতে হবে। যেমন আবহাওয়ার পূর্বাভাস। আমরা এখন তিন দিনের বন্যার পূর্বাভাস দেই, ২৪ ঘণ্টা কিংবা সপ্তাহের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেই। এটাকে তিন মাস কিংবা চার মাস পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ আমাদের সময় এসেছে কোপেনহেগেন থেকে কানকুনের অর্জনকে সামনে রেখে কানকুনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের যা প্রয়োজনীয়, ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্লানটিকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে খুব দ্রুত একটি দলিল তৈরি করে ফেলতে হবে যে বিশ্বের কাছে আমরা কী চাই। আমাদের কী করতে হবে তার দলিল ২০০৯-এ তৈরি হয়েছে। এর কতটুকু বিশ্বের কাছ থেকে চাই, আর কতটুকু নিজেরা মোকাবেলা করতে পারব, সেটা এখনই স্পষ্ট করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রযুক্তি

হস্তান্তর এবং দক্ষতা বৃদ্ধির নামে আবারও যেন হাজারও কনসালটেন্টে দেশ না ভরে যায়।
বাংলাদেশের গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপাদনও অতি সামান্য। মাথাপিছু ০.২ থেকে ০.৩ টনের মতো। পৃথিবীর গড়ের তুলনায় আমরা অনেক অনেক কম আছি। তারপরও আমরা যদি কিছুটা কমাতে পারি তবে তা ভালো হবে। কিন্তু এর জন্য স্বাভাবিকভাবেই প্রযুক্তির হস্তান্তর এবং অর্থায়নের প্রয়োজন হবে। আমার মতে, সব দেশেরই প্রকাশযোগ্য, পরিমাপযোগ্য এবং যাচাইযোগ্য– এ তিনটি বিষয়ে নমনীয়ভাব নিয়ে বৈশ্বিক একটা স্ট্যান্ডার্ডের মাধ্যমে এগোনো উচিত। কারণ আমার নিজের হিসাব-নিকাশ সঠিক না হলে অন্যদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যাবে না।

শেখ রোকন: আন্তর্জাতিক দরকষাকষি প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ও ভাবমূর্তি কেমন?
আইনুন নিশাত: জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে আন্তর্জাতিকভাবে আমরা ইতিমধ্যে বাংলাদেশের অবস্থানকে অনেক উঁচুতে নিয়ে গেছি। আমরা দেখাতে পেরেছি আমাদের কী কী সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, আমরা দেখাতে পেরেছি আমাদের সমাধান কীভাবে আসবে। এখন প্রয়োজন এই সমাধানগুলো কার্যকর পদক্ষেপে রূপান্তরিত করা।

দৈনিক সমকালে ২২ ডিসেম্বর, ২০১০ এবং ১২ জানুয়ারি ও ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ অনুলিখিত নিবন্ধ আকারে প্রকাশিত

ড. আহসান উদ্দিন আহমেদ
জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণায় বাংলাদেশ নজির সৃষ্টি করছে

সেন্টার ফর গ্লোবাল চেঞ্জের (সিজিসি) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসানউদ্দিন আহমেদ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক গবেষণায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিশেষ করে অভিযোজন বিষয়ক গবেষণায় তার দক্ষতা বিশ্বস্বীকৃত। তিনি আইপিসিসি ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য এবং আন্তর্জাতিক প্যানেলটির তৃতীয় ও চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখেন। ড. আহসান বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদেরও নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। যুক্ত ছিলেন বিসিএএসের সঙ্গেও। তিনি ১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি অনার্স ও পরের বছর এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ক্লার্কসন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বাংলাদেশ ছাড়াও তিনি কেনিয়া, নেপাল এবং পেরুতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে তার উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রকাশনা ও নিবন্ধ রয়েছে।

শেখ রোকন: আমরা জানি, সাগরে নিম্নচাপের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং জেলেদের জীবন-জীবিকার ওপর এর প্রভাব নিয়ে বছর দুয়েক আগে আপনি গবেষণা করেছিলেন। এ বিষয়ে বলুন।
আহসানউদ্দিন আহমেদ : তিন বছরের বেশি সময় হলো, ২০০৭ সালে। বিষয়টি হঠাৎই ধরা পড়েছিল যে, উপকূলীয় সতর্কতা সংকেত জারির প্রবণতা বেড়ে গেছে। এর ফলে মৎস্যজীবীদের জীবিকায় ব্যাপক প্রভাব পড়ে। যে কোনো মাত্রার সতর্কতা সংকেত জারি মানে গভীর সমুদ্রের মাছ আহরণ করা যাবে না। আর গভীর সমুদ্রেই সবচেয়ে ভালো মাছ পাওয়া যায়। ইলিশসহ আমরা যেসব মাছ সচরাচর খেয়ে থাকি, সেগুলো হয়তো মোহনা অঞ্চলে পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য বড় বড় মাছ, যেগুলো রফতানিও হয়– সেগুলোর আহরণ ক্ষেত্র গভীর সমুদ্রে। মৎস্যজীবীদের সঙ্গে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন করে আমরা জেনেছি, এ ধরনের মাছ ধরার সবচেয়ে ভালো সময় হচ্ছে মৌসুমি বায়ুর চাপ যখন বেশি থাকে। তখন সমুদ্র উপরিতলের তাপমাত্রা একটু বেশি থাকে। তখন আবার নিম্নচাপও বেশি হয়। ঘূর্ণিঝড়ও কিন্তু আসলে প্রবল নিম্নচাপ। বড় বড় ঘূর্ণিঝড় সাধারণত মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য মে এবং মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বরে হয়। কিন্তু এই দুই সময়ের মধ্যে সমুদ্র উত্তাল হয় অনেকবার। ২০০৭ সালে তথ্য ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমরা বুঝতে পারছিলাম, এমন উত্তাল হওয়ার সংখ্যা গড়পড়তা অনেক বেড়ে গেছে। আগে যেখানে ৫-৬টি হতো, সেটা দাঁড়িয়েছে ১০-১২টায়।

আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা ও তথ্য-উপাত্ত যাচাই করে আমরা দেখলাম, বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে ৪০-৪৫ বছর ধরে সমুদ্র উপরিতলের তাপমাত্রা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের দুই মৌসুমে ৪০ বছরে গড়ে আধা ডিগ্রির কাছাকাছি তাপমাত্রা বেড়েছে। ২০০৭ সালের ওই প্রকাশনার পর বিষয়টি নিয়ে আমরা আরও কাজ করেছি।

শেখ রোকন: গবেষণার কাজটি কি আপনি একা করেছিলেন? কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ছিল?

আহসানউদ্দিন আহমেদ : সিএসআরএল আমাদের সহায়তা করেছিল; গবেষণার কাজটি শারমিন্দ নীলোর্মিসহ দু'জন মিলে করি। এর মধ্যে বিজ্ঞানের পাশাপাশি সামাজিক গবেষণাও ছিল। জেলেরা কী ভাবছে, তাদের জীবনযাত্রায় নিম্নচাপের সংখ্যা বৃদ্ধির কী প্রভাব পড়েছে। আমরা ওই গবেষণায় দেখতে পাই, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জেলেদের জীবন-জীবিকায় সুনির্দিষ্ট প্রভাব পড়ছে। সম্ভবত বাংলাদেশে এটা একমাত্র ভৌত প্রমাণ, যা দিয়ে বলা যায় জলবায়ু পরিবর্তন না হলে গভীর সমুদ্রগামী জেলেদের জীবনযাত্রা ব্যাহত হতো না। অন্য যা কিছু প্রমাণ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা আমরা করে থাকি, তা জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে এখনও সরাসরি সম্পর্কিত নয়। যেমন বন্যা বা ঘূর্ণিঝড় আগেও হয়েছে, এখন হয়তো মাত্রা ও ঘনত্ব পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সমুদ্র উপরিতল উত্তাল করে তোলে জেলেদের জীবনযাত্রা ব্যাহতকারী নিম্নচাপের সংখ্যা আগে এত বেশি ছিল না। এখন তো জেলেরা নিজেরাই বলছে। বিজ্ঞানের ভাষায় হয়তো নয়, জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা বলার চেষ্টা করছে যে সাগর আর আগের মতো নেই।

শেখ রোকন: ওই গবেষণার কাজ তো বোধহয় এখনও চলছে?

আহসানউদ্দিন আহমেদ : আমরা প্রতি বছরই নিম্নচাপ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে চলছি। ২০০৭ সালে যে অল্প তথ্যের ভিত্তিতে আমরা গবেষণা করেছিলাম, এখন অনেক সমৃদ্ধ। এখন সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায়, সাগর উত্তাল হয়ে যাওয়ার ঘটনা আগের তুলনায় বেড়েছে। গত দু'বছরে তো একই মৌসুমে ১৪টিরও বেশি তিন নম্বর সতর্ক সংকেত দেখানো হয়েছে। আরও কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আমরা পাচ্ছি, একেকটি সতর্ক সংকেত জারি থাকার সময়কালও বেড়ে যাচ্ছে। আগে হয়তো একদিনেই সংকেত নামিয়ে ফেলা হতো। কারণ নিম্নচাপের ফলে বৃষ্টিপাত হতো এবং সমুদ্র উপরিতলের তাপমাত্রা কমে যেত। এখন আড়াই, তিন, এমনকি সাড়ে তিন দিন পর্যন্ত সতর্ক সংকেত জারি থাকছে। কারণ সমুদ্র সহসা শান্ত হচ্ছে না।

শেখ রোকন: আইপিসির চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, উষ্ণায়ন এত বাড়লে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এতটা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের

উচ্চতা বৃদ্ধির এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের এখানে কোনো গবেষণা হয়েছে কি-না?

আহসানউদ্দিন আহমেদ : নব্বইয়ের মাঝামাঝি একটা কাজ হয়েছে, যেটাকে আপনি গবেষণাপত্র বলতে পারেন। কিন্তু সেটাতে বৃদ্ধির যে হার দেখানো হয়েছে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যে কয়েক বছরের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে, তা দিয়ে ঠিক জলবায়ু পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট ভিত্তি দাঁড় করানো মুশকিল। জলবায়ু পরিবর্তন ৫-৭ বছরের তথ্য দিয়ে বিচার করার বিষয় নয়। কারা কাজটি করেছে, আমি নাম বলতে চাই না। সেখানে পরিবর্তনের যে ধারা দেখানো হয়েছে, তা প্রায় অবিশ্বাস্য। কারণ পৃথিবীর আর কোথাও এত দ্রুত পরিবর্তন দেখা যায়নি। এত তীব্র পরিবর্তন যদি দীর্ঘ সময় ধরে হয়ে থাকত, তাহলে দেশের বহু অঞ্চল এখন পানির নিচে থাকার কথা। এছাড়া গবেষণাটিতে বিজ্ঞানের যেসব বিষয় বিবেচনা করা উচিত ছিল, তার সবগুলো করা হয়নি। সি লেভেল রাইজ বলে যে শব্দ আইপিসিসিসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষ থেকে বলা হয়, তা সার্বিকভাবে হচ্ছে নেট সি লেভেল রাইজ। অর্থাৎ যোগ-বিয়োগ করে বলতে হবে। যোগ-বিয়োগের প্রশ্ন আসে কেন? সি লেভেল রাইজ মানে হচ্ছে ভূমি যেমন আছে তেমন থাকবে, সমুদ্রপৃষ্ঠ উঠে আসবে। কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে সেডিমেন্টেশন প্রক্রিয়া। আবার ওপরে যতটুকু পলি পড়ে, তা আস্তে আস্তে ঘনীভূত হয়। তাহলে পলি অবক্ষেপণ, সংকোচন এবং সমুদ্র উপরিতলের উচ্চতা বৃদ্ধি– তিনটির সার্বিক ফলাফল হচ্ছে সি লেভেল রাইজ। ওই গবেষণায় সবদিক বিবেচনা করা হয়নি। অবশ্য ওই গবেষণা যখন হয়েছে, তখন আমাদের জানাবোঝা এখনকার মতো ভালো ছিল না। এসব পর্যবেক্ষণের যে অত্যাধুনিক পদ্ধতি এখন আছে, তা ওই গবেষণায় ব্যবহৃত হয়নি। গবেষণার ফল প্রকাশের আগে স্যাটেলাইটের তথ্য-উপাত্তের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা উচিত ছিল। সেখানে মাত্র সাত বছরের গড়কে দীর্ঘ সময়ের গড় বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন ছিল। যেমন নদীর মুখে যদি উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়, প্রতি বছর কি একই স্থানে, একই দিনে একই সময়ে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব? জোয়ার-ভাটার কারণেও তো একই দিনে নদীর চেহারা পরিবর্তন হয়। আমি বলতে চাচ্ছি, ওই গবেষণার ফল বিজ্ঞানভিত্তিক ছিল না।

শেখ রোকন: কিছুদিন আগে আরেকটি গবেষণার কথা আমরা শুনেছি, যেখানে বলা হয়েছে নদীবাহিত পলিতে ভূমিগঠন প্রক্রিয়ার কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব না-ও পড়তে পারে। সংবাদমাধ্যমে এ নিয়ে খবরও হয়েছে।

আহসানউদ্দিন আহমেদ : হ্যাঁ, গবেষণাটি এবং এ বিষয়ে রিপোর্টিংও দেখেছি। সেখানে কিন্তু বলা হয়নি যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে না। এখানেও যোগ ও বিয়োগের ব্যাপার। নেট সেডিমেন্টেশন রেট এবং নেট সি

লেভেল রাইজ রেটের মধ্যে যদি সেডিমেন্টেশন বেশি হয়, তাহলে ভূমি গঠিত হবেই।
ঐতিহাসিকভাবে আমরা জানি, গড় ও পাহাড়ি অঞ্চল বাদ দিলে আমাদের পুরো ভূখণ্ড গড়ে উঠেছে সেডিমেন্টেশনের মাধ্যমে। বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ। কিন্তু যদি বৈজ্ঞানিক তথ্য দেখি, বাংলাদেশি এক ভূগোলবিদ শহীদুল ইসলাম ইংল্যান্ডে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি কার্বনডেটিং করে দেখেছেন ১০ হাজার বছর আগে সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে ছিল আমাদের তটরেখা। তাহলে ১০ হাজার বছরে বাকি ভূখণ্ড বেড়েছে। এখন জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এত লম্বা হিসাব বেমানান। আগামী ৩০-৫০ বছরে ভূমি গঠন হবে না ডুবে যাবে, সেটা বিবেচনার বিষয়। আমি মনে করি, যে হারে বদ্বীপ গড়ে উঠেছে এবং যে হারে বরফ গলা পানি উজান থেকে আসছে, সমুদ্র উপরিতলের তাপমাত্রা যে হারে বাড়ছে– এই তিনটি বিষয় যদি ঠিক থাকে, তাহলে খুব সম্ভবত পলি অবক্ষেপণের চেয়ে ভূমি ডুবে যাওয়ার হার বেশি হবে। এটাই হওয়ার কথা।

শেখ রোকন: বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাস্তুচ্যুতি বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে । আমরা যতদূর জানি, এ বিষয়ক একটি গবেষণা কাজ রয়েছে আপনার।
আহসানউদ্দিন আহমেদ : আমরা সেটা ২০০৮ এর শেষ দিকে করেছিলাম। ২০০৯ সালে এটা নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছিল। আমরা বলার চেষ্টা করেছিলাম, জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা বেড়ে গেলে কিছু কিছু মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়তে পারে। অথবা জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়ায় ঋণ নিয়ে সামাল দেয়। কিন্তু পরে সেই ঋণের ধাক্কায় বাস্তুহীন হয়ে পড়ে। অথবা জীবিকার সন্ধানে অগত্যা বাড়ি ছাড়তে পারে অনেকে। এই প্রক্রিয়া কীভাবে ঘটতে পারে, কীভাবে মানুষ শহরমুখো হতে পারে বা একসময় দেশের বাইরে চলে যেতে পারে আমরা সেদিকটা ইঙ্গিত করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, সরকার একটা নীতি গ্রহণ করুক। যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিপুলসংখ্যক দরিদ্রতম মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হবে, তাদের জন্য আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সরকার সহযোগিতা করতে পারে কি-না। কারণ উন্নত অর্থনীতির দেশের গ্রিনহাউস গ্যাস উদগিরণের কারণেই তো তারা বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হচ্ছে। যারা এ জন্য দায়ী, সেইসব দেশে অভিবাসন করা যায় কি-না। আইপিসিসির প্রথম প্রতিবেদনেও কিন্তু তিনটা দায়িত্বের কথা বলা হয়েছিল। প্রথমত গ্রিনহাউস গ্যাস উদগিরণ হ্রাস করা, দ্বিতীয়ত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অভিযোজন করা এবং তৃতীয়ত, পরিষ্কারভাবে বলা ছিল, রিলোকেশন বা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করা। কিন্তু ইদানীংকালের দলিলপত্রগুলোতে তা আর বলা হচ্ছে না।
আইপিসিসির প্রথম প্রতিবেদনকে ভিত্তি ধরে আমাদের মতো দেশ, যারা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে, তারা দাবি করতে পারে যে

এই অভিবাসন প্রক্রিয়ায় ইউএনএফসিসির আওতায় আন্তর্জাতিকভাবে সহযোগিতা করা হোক।
বিষয়টি প্রথমদিকে এমনকি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলও আন্তর্জাতিক ফোরামে তুলতে চায়নি। কিন্তু আশার কথা হচ্ছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১০ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনসহ একাধিক আন্তর্জাতিক সভায় বিষয়টি তুলেছেন। ফলে কানকুনে পরিবেশমন্ত্রির বক্তৃতায়, যেটি বাংলাদেশের পক্ষের সাবমিশন হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, বিষয়টির উল্লেখ আছে। কানকুনে প্রায় ঐকমত্যের যে দলিল তৈরি হয়েছে, সেখানেও অভিবাসনের কথা এসেছে। শুধু তাই নয়, আরেকটু এগিয়ে গিয়ে অভিবাসন পরিকল্পনায়ও সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া হয়তো অচিরেই শুরু হতে পারে। আমরা আমাদের দাবি অব্যাহত রাখতে পারি।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব তো শুধু উপকূলে নয়, দেশের অভ্যন্তরেও পড়বে। এ বিষয়ে আপনার একটি গবেষণা আছে।
আহসানউদ্দিন আহমেদ : অবশ্যই পড়বে, তীব্রভাবে পড়বে। ওই গবেষণায় আমরা বিষয়টি দেখার চেষ্টা করেছি ৩০টি অ্যাগ্রো-ইকোলোজিকেল জোনে। বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসের বিষয় মাথায় রেখে আমরা সবচেয়ে বিপন্ন এলাকা আলাদাভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। কোন অঞ্চল থেকে ভবিষ্যতে বাস্তুচ্যুতি তীব্র আকার ধারণ করে, সেটা বোঝার চেষ্টা করেছি। যাতে করে জাতীয় পর্যায়ে বোঝাপড়া সহজ হয়। আমরা বোঝানোর চেষ্টা করেছি, কোথায় আমাদের পরিকল্পনাগত জোর দিতে হবে। কোথায় দরিদ্র মানুষকে টিকে থাকার লড়াই এবং বাস্তুচ্যুতি রোধে সহযোগিতা দেওয়ার প্রয়োজন হবে। আমরা যেন আগাম উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে পারি। জলবায়ু পরিবর্তন হলেও ওইসব অঞ্চলের মানুষ যেন নির্বিঘ্নে জীবনযাত্রা পরিচালনা করতে পারেন।

শেখ রোকন: এ ধরনের গবেষণা করতে গিয়ে সরকারের দিক থেকে কোনো ধরনের সহায়তা পেয়েছেন কি?
আহসানউদ্দিন আহমেদ : এই তিনটি গবেষণায় ছিল না। তবে আমি এভাবে বলতে চাই– আর্থিক সংশ্লিষ্টতা না থাকলেও কোনো না কোনো সময় আমরা সরকার পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত যেসব গবেষণা শুরুর দিকে হয়েছে, সেগুলোতে জড়িত ছিলাম। এখনকার গবেষণাগুলোতে আগের কাজ ও প্রস্তুতির যে কোনো ভূমিকা নেই, তা বলা ঠিক হবে না। আর আমি সরকারি-বেসরকারি ভাগ করতে চাই না। এটা ঠিক, সরকারের নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান এবং তাদের সুনির্দিষ্ট কাজ আছে। তাদের দেওয়া ম্যান্ডেট অনুযায়ী আমরা অনেক সময় কাজ

করি। সবকিছু মিলেই আসলে বাংলাদেশের গবেষণা হয়ে ওঠে। এটা ঠিক, গবেষণায় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো একটু পিছিয়ে আছে; সেজন্য আমাদের অংশগ্রহণ অনিবার্য হয়ে ওঠে, প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

শেখ রোকন: সরকারি-বেসকারি মিলিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বা সংশ্লিষ্ট গবেষণা বাংলাদেশে কেমন হয়েছে?

আহসানউদ্দিন আহমেদ : ধারাবাহিকতা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আলোচনার ঢেউ এখানে এসে লাগার আগেও বরং কিছু গবেষণা কাজ হয়েছে। শুরুর দিকে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিইউপি, বিসিএএস, বিআইডিএস কাজ করেছে। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে আইডব্লিউএম ও সিজিইআইএস জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণায় এগিয়ে এসেছে। স্পারশোর কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে কাজ করেছেন। অল্প কিছু মানুষ এ ব্যাপারে উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক গবেষণার ভিত্তি দাঁড়িয়ে গেছে মধ্য নব্বইয়ে। যদিও সমাজে তার প্রতিফলন, পত্র-পত্রিকায় প্রতিবেদন, ফলাফল নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে তুলনামূলক দেরিতে। নীতিগত পর্যায়ে এর প্রতিফলন শুরু হয়েছে ২০০৭ সালের দিকে। প্রথম দিকের গবেষণায় মানুষ প্রায় অনুপস্থিত ছিল। ২০০০ সালের দিকে দিকে মানুষ ও প্রতিবেশের ওপর আলোকপাত করা হয়। বিষয়টি বুঝতে কিছুটা সময় চলে গেছে; কিন্তু এখন নানা ধরনের গবেষণা হচ্ছে। আইসিডিডিআরবির মতো প্রতিষ্ঠান জলবায়ু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণা করছে।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে কীভাবে খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখা যায়, সে বিষয়েও তো গবেষণা জরুরি।

আহসানউদ্দিন আহমেদ : জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে গবেষণার যে ঢেউ মধ্য নব্বইয়ে উঠেছিল, তা চমৎকারভাবে বাংলাদেশ কৃষি ক্ষেত্রেও লেগেছে। কৃষিতে যেসব গবেষণা হয়েছে, অভিযোজন প্রক্রিয়ায় তা বিশ্বের জন্য নজির হয়ে থাকবে। পানিসহিষ্ণু, অর্থাৎ ছোট চারা পানিতে ডুবে গেলেও নষ্ট হবে না– এমন দুটি জাত নিয়ে তিন বছর হলো মাঠ পর্যায়ে গবেষণা চলছে। তার আগে নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে গবেষণাগারে চমৎকার ফল দিয়েছে। এখন দেখা হচ্ছে চাষিদের হাতে কেমন ফল দেয়। লবণসহিষ্ণু তিনটি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। তবে ফলাফল এখন পর্যন্ত মিশ্র। সেটাই হওয়ার কথা। কারণ প্রত্যেক বছর সমান যাবে না। খরাসহিষ্ণু জাত নিয়ে এখনও কাজ চলছে। যে জিনটি খরা প্রতিরোধক, সেটা চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি প্রচলিত জাতে প্রতিস্থাপন করা গেলে আমরা আশা করতে পারি আগামী দু'চার বছরের মধ্যে খরাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন সম্ভব হবে।

কৃষি খাত নিয়ে আমি আশাবাদী, বাংলাদেশ বিশ্বে নজির সৃষ্টি করতে পারবে যে, ব্যাপক মাত্রায় জলবায়ু পরিবর্তন ঘটে যাওয়ার আগেই একটি স্বল্পোন্নত দেশ

চাইলে গবেষণা ও প্রযুক্তির মাধ্যমে তার বিপদের মাত্রা অনেক কমিয়ে আনতে পারে। সম্ভবত আমরা আগের চেয়েও ভালোভাবে উৎপাদনের মাত্রা অব্যাহত রাখতে পারব।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বৈশ্বিক গবেষণা প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ বা সম্পর্ক কতটা?

আহসানউদ্দিন আহমেদ : কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে না হলেও ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশের অনেক গবেষকের সঙ্গে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগসূত্রতা তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করছেন। আমি জানি, এ মুহূর্তে কয়েকজন বিদেশি পিএইচডি গবেষক বাংলাদেশে কাজ করছেন, যাদের কো-অ্যাডভাইজার বাংলাদেশি। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবেও আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বুঝতে হলে, অভিযোজন প্রক্রিয়া বুঝতে হলেও সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশটিতে যেতে হবে। আমার মতে, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণায় বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। অন্যদের জন্য নজির সৃষ্টি করছে, প্রত্যয়ের জন্ম দিচ্ছে।

দৈনিক সমকাল
১৯ জানুয়ারি, ২০১১

জিয়াউল হক মুক্তা

জলবায়ু ইস্যুতে এখন সরকার ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার বক্তব্যে ফারাক নেই

জিয়াউল হক মুক্তা বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অক্সফামের পলিসি অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছেন। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে। মানুষ ও মানুষের সংস্কৃতির মতো অঞ্চলনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলেও পেশাগতভাবে মনোযোগ দিয়েছেন মূলত বৈশ্বিক সামষ্টিক নীতি ও প্রতিষ্ঠান বিষয়ে। পরবর্তী সময়ে পড়াশোনা করেছেন আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে। বিশ্বায়ন, বহুপক্ষীয় বাণিজ্য আলোচনা ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, কৃষি ও খাদ্যনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বহুপক্ষীয় আলোচনা আর জাতীয় পরিকল্পনা ও অর্থায়ন, শ্রমিক অধিকার ও নারী অধিকার তার কাজের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র। ব্যাপক তৃণমূল অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি কাজ করছেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আন্তঃসাংস্কৃতিক দলের সদস্য হিসেবে। কাজের ক্ষেত্রে সব সময়ই প্রাধান্য দেন তৃণমূলের জনগণ ও নাগরিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সমাজের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্টতায়। বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ক্ষমতায়ন ও স্বাধীনভাবে নীতিনির্ধারণের অধিকার বিষয়ে সর্বত্র তিনি সব সময় সোচ্চার। রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রতি গভীরতর আগ্রহের জায়গা থেকে বর্তমানে তিনি কাজ করছেন সামগ্রিক কৃষি সংস্কার কর্মসূচি নিয়ে। কৃষি, বাণিজ্যনীতি, নারী অধিকার, শ্রমিক-অধিকার বিষয়ে তার বেশ কিছু জনপ্রিয় পুস্তিকা ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

শেখ রোকন: আমরা জানি, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আন্তর্জাতিকভাবে যে আলাপ-আলোচনা ও দরকষাকষি চলছে, তা মূলত আন্তঃরাষ্ট্রীয়। এ প্রক্রিয়ায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কী ধরনের ভূমিকা রাখছে?

জিয়াউল হক মুক্তা: আইপিসিসি (ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) কিংবা ইউএনএফসিসিসির (ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) মতো প্রক্রিয়াগুলোতেও এনজিওর ভূমিকা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আলোচনা প্রক্রিয়ায় এনজিওগুলো পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করে থাকে। এসব প্রক্রিয়ার বাইরেও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো বিশ্বের দেশে দেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের কাজের সঙ্গে ব্যাপকভাবে যুক্ত।

একটা সময় ছিল যখন এনজিওগুলো পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করত। ফলে বিশেষ ধরনের প্রাণী বা উদ্ভিদ বিপন্ন হয়ে পড়ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করত এবং এগুলো সংরক্ষণে বিশ্ব জনমত ও

রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আবেদন জানানো এক ধরনের পরিবেশবাদী প্রবণতা। সাম্প্রতিককালে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি যখন আরও ব্যাপকভাবে স্পষ্ট হচ্ছে, বিশেষত আইপিসিসির চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ এবং বালি সম্মেলনের পর, পরিবেশবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন উন্নয়ন সংগঠনগুলোও ব্যাপকভাবে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ শুরু করে। কারণ এরই মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন কেবল পরিবেশ-প্রতিবেশগত বিষয় নয়, মানব প্রজাতি এবং তার বাসস্থান পৃথিবীর অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মানুষের ওপরই সবচেয়ে বেশি পড়ছে এবং পড়বে। সে বিবেচনায় পরিবেশবাদী সংগঠনের বাইরে উন্নয়ন সংগঠনগুলোও সক্রিয় হয়েছে– বাংলাদেশ থেকে শুরু করে ইউরোপ-আমেরিকা, বিশ্বের সর্বত্র।

শেখ রোকন: কিছু বিষয়ে জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে এনজিওগুলো সমালোচনা করে থাকে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে দু'পক্ষ কীভাবে কাজ করছে?

জিয়াউল হক মুক্তা: জলবায়ু পরিবর্তন ও সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে ব্যাপকভাবে প্রথম আলোচনা শুরু হয় ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনোরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে। সে সময় থেকেই এনজিওগুলো জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। রাষ্ট্রগুলো যেখানে নিজস্ব স্বার্থরক্ষায় বেশি জোর দেয়, এনজিওগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে মানবজাতির ভবিষ্যৎ, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ, দরিদ্র মানুষের ভবিষ্যতের প্রতি আলোকপাত করে থাকে এবং রাষ্ট্রগুলোকে এ ব্যাপারে চাপ দেয়। আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রগুলোকে নিজ নিজ স্বার্থের সঙ্গে এসব বিষয়েও নজর দিতে বাধ্য করার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে সাফল্য পেয়েছে এনজিওগুলো। আনুষ্ঠানিক আলোচনা কিংবা দরকষাকষির ক্ষেত্রে এনজিওগুলো যেভাবে চাপ দিয়ে থাকে বা সমালোচনা করে, আমার মতে তা ধনাত্মক। মানবজাতির সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের পরিপূরক ভূমিকা রয়েছে। বিরোধিতা বা নেতিবাচক নয়। এটা নেগোসিয়েশনেরই একটি প্রক্রিয়া। সরকার, এনজিও, বেসরকারি খাত, সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে এ ধরনের বহুমাত্রিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এ জাতীয় প্রক্রিয়া এগিয়ে যায়।

শেখ রোকন: দেশের ভেতর জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বেসরকারি সংস্থাগুলো কীভাবে কাজ করছে?

জিয়াউল হক মুক্তা: বাংলাদেশে এমন কিছু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা রয়েছে, বিশ্বব্যাপীই যেগুলোর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। আমাদের দেশের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম বলা যায়, যারা কেবল বাংলাদেশ নয়, সারাবিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আলোচনা, গবেষণা ও দরকষাকষির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশে তারা যদিও স্বল্পসংখ্যক সংগঠনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছেন, তাদের অবদানকে

কেবল সংখ্যা দিয়ে বিবেচনা করা যাবে না। গুণগত দিক থেকেও বিবেচনা করতে হবে। দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি ইস্যু হিসেবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা অনেক আগে থেকে নীরবে-নিভৃতে কাজ করেছেন। সাম্প্রতিককালে অবশ্য উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে কাজ করছে, কথা বলছে। আমরাও তার মধ্যে আছি। এ ক্ষেত্রে আমরাও নতুন; কিন্তু অনেক সময়ই জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিজ্ঞাননির্ভর বিষয় নিয়ে অনেকে যথাযথ অনুধাবন ছাড়াই শুনে শুনে বলার চেষ্টা করেন। তাতে করে অনেক সময় অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়। কেউ কেউ জেনে-বুঝেও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে অস্পষ্টতা তৈরির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছেন। এ ক্ষেত্রে আরও লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মধ্যে হুজুগে মেতে ওঠার প্রবণতা রয়েছে। আপনি দেখবেন, যখন বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা নিয়ে বিশ্ব পরিসরে আলাপ-আলোচনা চলছিল, তখন দেখা গেছে যে কোনো কিছুর সঙ্গে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা যুক্ত করে প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি এবং কাজ বাগানোর চেষ্টা চলেছে। নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি নিয়েও একসময় আমরা এমন দেখেছি। এখন শুরু হয়েছে যে কোনো প্রকল্পের সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন যুক্ত করে অর্থ সংগ্রহের প্রয়াস। এর ফল ভালো হতে পারে না। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কাজের ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি আছে; কিন্তু আরও অনেক দূর যেতে হবে আমাদের। আরও জ্ঞান ও বিজ্ঞাননির্ভর হতে হবে আমাদের।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বাংলাদেশে যেসব বেসরকারি সংস্থা কাজ করছে, আমরা দেখছি যে তাদের মধ্যে যেমন কিছু জাতীয় বা স্থানীয়, তেমনি কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। আপনি নিজেও একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে?

জিয়াউল হক মুক্তা: নিশ্চয়ই পার্থক্য রয়েছে। আমার পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, এখানে এমন দু'একটি জাতীয় সংগঠন রয়েছে, যারা বিশ্বমানের কাজ করার যোগ্যতা রাখে। সেগুলোর কোনো কোনোটি অনেক ভালো কাজ করছে, আবার জলবায়ু পরিবর্তন যেহেতু সমসাময়িক বিষয় এবং এতে অর্থায়নের অভাব নেই; ফলে এই সুযোগে কোনো কোনো সংগঠন রি-প্যাকেজিংয়ের কাজ করছে। যেমন দুর্যোগসংক্রান্ত কাজগুলোকে এখন জলবায়ু পরিবর্তনের কাজ হিসেবে মোড়ক পরানো হচ্ছে। পাশাপাশি অনেক তৃণমূল সংগঠন রয়েছে, যারা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে 'কাজ' করে থাকে। আগে যেমনটি বললাম, কোনোভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি যুক্ত করে প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করে থাকে। আবার উল্টো চিত্রও আছে। গত তিন বছর ধরে আমরা গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচারাভিযানের পক্ষ থেকে, যা প্রায় আড়াইশ' সংগঠনের একটি কোয়ালিশন, সারাদেশে কাজ করার চেষ্টা করছি। তাদের অনুধাবনগুলোকে

কীভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা যায়, সে চেষ্টা আমরা করছি। ২০০৭-০৮ সালে আমরা সারাদেশে শতাধিক জলবায়ু শুনানির আয়োজন করেছিলাম। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ কীভাবে নিজের জীবন ও জীবিকার সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি মিলিয়ে দেখছে। তারা কীভাবে দেখছে এই পরিবর্তনকে। সেটা কোনো বিশেষজ্ঞ মত নয়, সাধারণ মানুষের সেই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বয়ান তুলে এনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি। আমরা কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন, যেখানে প্রায় ৩৭টি দেশের আইনসভার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন, তাদের মাঝখানে বাংলাদেশের সাতক্ষীরার গাবুরা এলাকার নারীদের নিয়ে গেছি। তারা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জের নারীদের ডাচ পার্লামেন্টে এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্টে নিয়ে গেছি। এশিয়া প্যাসিফিক জলবায়ু শুনানি, এমনকি কোপেনহেগেনেও আমরা আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীদের নিয়ে গেছি। একদিক থেকে বলা যায়, সীমিত অনুধাবনের মধ্যেও এর সর্বোচ্চ ব্যবহার আমরা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে গত তিন বছরে যে সচেতনতা তৈরি হয়েছে, সেখানে তৃণমূল কিংবা আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

শেখ রোকন: ছোট-বড় সব ধরনের উন্নয়ন সংস্থা সাম্প্রতিককালে জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত কার্যক্রমে বেশি জোর দেওয়ার ফলে উন্নয়নমূলক অন্যান্য কর্মসূচি ব্যাহত হচ্ছে কি-না?

জিয়াউল হক মুক্তা: এখন জলবায়ু পরিবর্তনকে উন্নয়নের মূল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাইরে দেখা ঠিক হবে কি-না? যেমন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তার একটি লেখায় বলেছেন এবং ইউএনডিপি'র একটি প্রতিবেদনেও দেখা যায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সেখানেই সবচেয়ে বেশি পড়বে, যেখানে সুশাসন অত্যন্ত নাজুক। ফলে সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া যেখানে চালু থাকবে, সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত স্বাভাবিকভাবে কম হবে। উন্নয়ন প্রক্রিয়া যেখানে ব্যাহত হবে, সেখানে অভিঘাত বেশি হবে। সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তনকে উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার উপায় নেই; বরং উন্নয়ন প্রক্রিয়া কতটুকু জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সহনশীল, সেটা বিশেষভাবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কতটুকু জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। এখানে বলে রাখা ভালো, কোন দুর্যোগ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আর কোনটি স্বাভাবিক কারণে তা কারও পক্ষে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব না। যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বাড়বে। এখন কোন ঘূর্ণিঝড়টি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হয়েছে, সেটা কীভাবে বুঝব আমরা? আবহাওয়া সংশ্লিষ্ট চরম ঘটনার মোট সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়েছে কি-না, সেটা হয়তো বলা সম্ভব।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈজ্ঞানিক ও বিশ্বের জন্য নতুন বিষয়। এর অভিঘাত প্রকৃতি ছাড়াও উৎপাদন, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পড়বে। সে কারণে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে গবেষণামূলক কাজ খুব জরুরি। এনজিওগুলো এ ব্যাপারে কতটা কাজ করছে বলে আপনি মনে করেন?

জিয়াউল হক মুক্তা: বাংলাদেশের বহু বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করছে বলে শোনা যায়। এর মধ্যেও কোনো কোনো সংগঠন সত্যিকার অর্থেই অভিযোজন প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করছে। আবার কোনোটি বা অভিযোজনের নামে দুর্যোগ বিষয়ক কাজকে রি-প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। দু'রকম ঘটনাই আছে। তবে একটা বিষয় বলা যায়, স্থানীয় সংগঠনগুলো অভিযোজনের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। যেটা কি-না সরকরের পক্ষেও পালন করা কঠিন। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, দাতাগোষ্ঠী এমনকি সরকারও স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে পারে।

শেখ রোকন: কেউ কেউ অভিযোগ করেন, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো গবেষণার মতো মৌলিক কাজের বদলে প্রচার-প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ডে বেশি জোর দিচ্ছে...

জিয়াউল হক মুক্তা: আমি সেটা বলব না। আপনি যদি লক্ষ্য করেন, বাংলাদেশ হচ্ছে হাজার হাজার এনজিওর দেশ। অনেক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাও এখানে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক এনজিওর মধ্যে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন অভিযোজনের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করছে। অ্যাকশন এইড অভিযোজনের ক্ষেত্রে কিছু পাইলটিংয়ের কাজ করছে। অন্যান্য কিছু সংগঠনও এগিয়ে আছে। তারা সবাই কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে সহযোগীদের নিয়ে এসব কাজ করার চেষ্টা করছে। অক্সফাম গ্রেট ব্রিটেন, অক্সফাম নভিব, অক্সফাম হংকংও একইভাবে কাজ করছে। অভিযোজনের কাজই কিন্তু বেশি হচ্ছে। সচেতনতামূলক কাজের ক্ষেত্রে আমি বলব অক্সফাম স্থানীয় সহযোগীদের কিছু সহায়তা করেছে। তারা কিছু সচেতনতামূলক কাজ করেছে। সেটা কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। আমি নিজে এমন কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে বলতে পারি যে, আরও সচেতনতামূলক কাজ করা দরকার। আমরা জাতীয় সংসদের সদস্যদের সঙ্গেও জলবায়ু নিয়ে কাজ করছি।

আরেকটি কথা বলে নেওয়া ভালো, সচেতনতামূলক কাজ বেশি হলে বিভিন্ন গোষ্ঠী সেটাকে ভালো চোখে দেখে না। কারণ জনগণের কাছে সব তথ্য চলে গেলে তাদের স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে। ফলে আরও বেশি সচেতনতামূলক কাজ পরিচালনা করা দরকার। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সরকারের যে অর্থায়ন হবে, এনজিওদের যে অর্থায়ন হবে, দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় দাতাদের যে অর্থায়ন হবে, সেগুলো নিয়ে অনেক বেশি জনসচেতনতা দরকার।

শেখ রোকন: জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কীভাবে কাজ করছে?

জিয়াউল হক মুক্তা: কিছু সমালোচনা ও সীমাবদ্ধতা থাকলেও শিক্ষা খাতে আমরা অতীতে সরকার ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে ব্যাপক সহযোগিতা দেখেছি। সাম্প্রতিককালের এমন উদাহরণ হতে পারে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু। এ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার একটি মনোভাব আমাদের দেশে রয়েছে। ২০০৭ সালের ডিসেম্বর থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে নতুন ধরনের বহুপক্ষীয় আলোচনা শুরু হয়। আমরা তখন থেকেই সরকারি দলে অংশ নিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করে যাচ্ছি। আপনি লক্ষ্য করবেন, বাংলাদেশ সরকারের দু'বছর আগেও আন্তর্জাতিক দরকষাকষিতে যে অবস্থান ছিল, এখন তা থেকে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এখন সরকার ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর বক্তব্যে তেমন কোনো ফারাক নেই। তার মানে বাংলাদেশের যেসব বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করে, সরকার তাদের বক্তব্য গ্রহণ করেছে এবং যথাযথ সাড়া দিচ্ছে। এতে করে সব দেশই লাভবান হয়েছে বলে আমি মনে করি।

শেখ রোকন: পারস্পরিক এ সহযোগিতার ক্ষেত্র কি তহবিল ব্যবস্থাপনা বা বিতরণেও সম্প্রসারিত? আমরা জানি, সরকার ১,৪০০ কোটি টাকার ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড করেছে। ওই তহবিল ব্যবহারে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর ভূমিকা কী?

জিয়াউল হক মুক্তা: ওই তহবিলের একটি অংশ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বরাদ্দ করা হয়েছে। একটি অংশ এনজিওগুলোর জন্যও বরাদ্দ হয়েছে। আমি যতদূর জানি, সরকার এরই মধ্যে এনজিওগুলোর অর্থছাড় শুরু করেছে।

শেখ রোকন: যেসব এনজিও এই অর্থ পেয়েছে, সেগুলোর কোনো কোনোটির উপযুক্ততা নিয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে...

জিয়াউল হক মুক্তা: আমরাও এসব সমালোচনা শুনেছি। এর সবচেয়ে বড় জবাব হচ্ছে, সুনির্দিষ্ট বাছাই প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতে তহবিল বরাদ্দ করা। ওই বাছাই প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে সবাইকে জানিয়ে দিলে কোনো সমালোচনা থাকার কথা নয়। আমি মনে করি, স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে নিজস্ব তহবিল থেকে অভিযোজন প্রক্রিয়ার জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রতি আমাদের বেশি জোর দেওয়া উচিত। মিটিগেশন বা নির্গমন হ্রাসের অর্থ আসা উচিত আন্তর্জাতিক উৎস থেকে। সরকার এদিকে নজর রাখবে আশা রাখি।

শেখ রোকন: বাংলাদেশের মিডিয়া জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কেমন ভূমিকা রাখছে?

জিয়াউল হক মুক্তা: আমি বলব, গত তিন বছরে আমরা সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা পেয়েছি মিডিয়ার কাছ থেকে। মিডিয়ার ব্যাপক ও সৃজনশীল ভূমিকা বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে যথাযথ মনোযোগ দিতে সহায়তা করেছে।

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্তদের সুরক্ষা ব্যবস্থা দাতব্য নয় অধিকারভিত্তিক হতে হবে

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ১৯৯২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৩ সালে যোগ দেন বেলায়। ১৯৯৭ সালে সংগঠনটির প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নির্বাচনী প্রচারণায় পরিবেশের জন্য হুমকিমূলক তৎপরতা এবং পরিবেশ বিনাশী জাহাজভাঙা শিল্পের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই করে তিনি দেশ-বিদেশে নজর কাড়েন। এছাড়াও জলাশয় ভরাট করে আবাসন তৈরি, পলিথিনের যথেচ্ছ ব্যবহার, পাহাড় কাটা, বন ধ্বংস, চিংড়ি ঘের, সেন্ট মার্টিনস দ্বীপে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ প্রভৃতি পরিবেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালিয়েছেন তিনি। আন্তর্জাতিকভাবে তিনি ফ্রেন্ডস অব আর্থ ইন্টারন্যাশনালের নির্বাহী সদস্য। এনভায়রনমেন্ট ল' অ্যালায়েন্স ওয়ার্ল্ডওয়াইড এবং এনভায়রনমেন্টাল ল' কমিশন অব দ্য আইইউসিএনের সঙ্গেও যুক্ত। সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান পরিবেশবিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৭ সালে জাতীয় পরিবেশ পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ২০০৯ সালে তিনি 'পরিবেশের নোবেল' খ্যাত গোল্ডম্যান এনভায়রনমেন্টাল প্রাইজ লাভ করেন। ২০০৯ সালে টাইম সাময়িকী তাকে হিরোজ অব এনভায়রনমেন্ট খেতাবে ভূষিত করে।

শেখ রোকন : অন্তত দু'বছর ধরে আমরা দেখছি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আইনগত দিক থেকে বাধ্যতামূলক একটি বৈশ্বিক চুক্তির জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু এখনও সেটা সম্ভব হয়নি। আদৌ কি সম্ভব?

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান : জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এখন পর্যন্ত কিন্তু দুটি দলিল রয়েছে, যেগুলোর আইনি বাধ্যবাধকতা আছে। একটি হচ্ছে ইউনাইটেড নেশন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা ইউএনএফসিসিসি এবং অন্যটি কিয়োটো প্রটোকল। কিয়োটো প্রটোকলে নির্ধারণ করা আছে উন্নত বিশ্ব কার্বন উদ্‌গিরণ কতটা কমাবে। সেটার মেয়াদ অবশ্য ২০১২ সালে শেষ হয়ে যাবে। কাজেই কার্বন নিঃসরণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের আরেকটি দলিল জরুরি হয়ে পড়েছে এবং সেটা এখন পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না।

কোপেনহেগেন অঙ্গীকার এবং কানকুনে যা হয়েছে, সেগুলো আইনগত দিক থেকে বাধ্যবাধকতামূলক নয়। আবার ইউএনএফসিসিসি আইনগত দিক থেকে বাধ্যতামূলক হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশ এটা এখনও অনুসমর্থন করেনি। যেমন করেনি কিয়োটো প্রটোকলও।

জলবায়ু পরিবর্তনকে দুটি দিক থেকে দেখা যায়। একটি হচ্ছে অভিযোজন। জলবায়ু পরিবর্তন হবেই, এটা আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। অনেক দেরি হয়ে গেছে। জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকানো সম্ভব না হলেও এখন ক্ষতি কমিয়ে রাখা সম্ভব। এজন্যই মূলত অ্যাডাপ্টেশন বা অভিযোজন। এই অভিযোজন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশলে করতে হবে। অন্য দিকটি হচ্ছে মিটিগেশন বা কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ। জলবায়ু পরিবর্তনের উপশম করা। এক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলো আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এই দায়িত্ব তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর নানাভাবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমাদের মতো দেশ কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী নয়। ফলে যারা এর জন্য দায়ী তারাই উপশম করুক। আমরা সেদিকেই জোর দেব। তারা কার্বন নিঃসরণ করবে আর আমরা অভিযোজন করে যাব, সেটা তো হতে পারে না। আমাদের অভিযোজনের ক্ষমতাও তো সীমিত।

শেখ রোকন : উন্নত বিশ্বের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের কথাও তো শোনা যায়। এর কোনো আইনগত ভিত্তি আছে কি?
সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান : হ্যাঁ, এই দাবি উঠেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আমরা দায়ী নই, অথচ আমাদের ক্ষতি হচ্ছে। তাহলে যারা এর জন্য দায়ী, তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায় কি-না। উন্নত বিশ্ব তাদের দায় অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, এমন দাবি এখনও উন্নত বিশ্বের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। যদিও ক্ষতির শিকার উন্নত বিশ্ব তা আদায়ের জন্য দাবি জানিয়েই যাচ্ছে। আমার মনে হয় না অদূর ভবিষ্যতে আইনি কোনো ব্যবস্থায় ক্ষতিপূরণ আদায় সম্ভব। কিন্তু এর ফলে উন্নত বিশ্বের ওপর একটা চাপ থাকবে। কারণ দাবিটি ন্যায্য। ন্যায়বিচারের দিক থেকে জরুরি। এছাড়া 'পলিউটাস পে' বলে একটি নীতি চালু আছে। পরিবেশ সংক্রান্ত অন্যান্য কনভেনশনে এটা আইনগতভাবে স্বীকৃত। পরিবেশগত ন্যায়বিচারের একটি স্বীকৃত নীতি। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দরকষাকষিতে এটি এখনও তেমন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। আইনগত বাধ্যবাধকতার বিষয়টি তো আরও দূর।

শেখ রোকন : আইসিজেতে তো পরিবেশবিষয়ক চেম্বার রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিপূরণ কি সেখানে আইনগতভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব?
সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান : ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে যেতে হলে প্রথমে উভয় পক্ষের সম্মতি প্রয়োজন হবে। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করে এবং যাদের এর জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়, উভয় পক্ষকেই আইসিজেতে যাওয়ার জন্য একমত হতে হবে। রাষ্ট্রীয় পক্ষ অন্য রাষ্ট্রকে সম্মত করে যেতে পারবে বলে আমি মনে করি না। তবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের নাগরিকরা চাইলে যেতে পারেন। তাতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু তার আগে নিজেদের দাবির পক্ষে যে পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত জোগাড় করা দরকার, তা কঠিন ব্যাপার। যেমন আইলার কেস নিয়ে

যদি আমরা আইসিজের কাছে গিয়ে বলি যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই ঘূর্ণিঝড় হয়েছে এবং তাতে এইসব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন ক্ষতিপূরণ চাই। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই যে আইলা হয়েছে, সেটা প্রমাণ করবেন কীভাবে? সে ধরনের বৈজ্ঞানিক তথ্য ছাড়া ওই আদালতে যাওয়া অর্থহীন। এছাড়া উন্নত বিশ্বের কোন দেশের কতখানি নিঃসরণের কারণে কতটুকু ক্ষতি হয়েছে, সেটারই বা প্রমাণ কোথায়?

শেখ রোকন : জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যাদের জীবন ও জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তারা দেশের অভ্যন্তরে আইনি সুরক্ষা পেতে পারে কি-না?
সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান : কথাটা বাংলাদেশে সম্প্রতি উঠেছে। বিশেষ করে সমুদ্রগামী জেলেদের কথা। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সাগরে নিম্নচাপের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এতে করে তাদের মাছ ধরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লোনাপানির আগ্রাসন হলে মিঠাপানির জেলেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কথা উঠেছিল এ ধরনের ক্ষুদ্র পেশাজীবীদের জন্য বীমার ব্যবস্থা করা যায় কি-না। কিন্তু বীমা মানে তো ক্ষতিগ্রস্তদেরই প্রিমিয়াম দিতে হবে। প্রিমিয়ামের বিপরীতে অর্থ পাওয়া যায়। এখন তারা প্রিমিয়াম দেবে কেন? জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য তো তারা দায়ী নয়। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যাদের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তারা ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারে কি-না, আইনি সুরক্ষা পেতে পারে কি-না, বীমা সুবিধা পেতে পারে কি-না; এগুলো এখনও রাফ আইডিয়া আকারে রয়েছে। কোনো ভিত্তি পায়নি।

শেখ রোকন : আর্জেন্টিনা, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার মতো কোনো কোনো দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জেলেরা সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে বলে কোথায় যেন পড়েছিলাম।
সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান : হ্যাঁ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে আর্জেন্টিনা কিংবা অস্ট্রেলিয়ার পরিস্থিতি সমান নয়। সেখানে সাধারণত পেশাজীবীদের বীমা করাই থাকে। ওই বীমার আওতা থেকেই তারা প্রতিকারের জন্য আদালতে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের এখানে কেবল ভাবনা-চিন্তা চলছে।

শেখ রোকন : আন্তর্জাতিকভাবে আরও কিছু কনভেনশন, চুক্তি বা সমঝোতা রয়েছে। যেমন জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত সিবিডি, সমুদ্র সম্পর্কিত আনক্লস। এগুলোর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্তরা প্রতিকার পেতে পারে না?
সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান : এগুলো হয়তো ইন্টারলিংকড হবে; কিন্তু প্রতিকার পাওয়া সহজ হবে না। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খোদ সিবিডিও হুমকির মুখে পড়তে পারে। লোনাপানির আগ্রাসন বেড়ে গেলে জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়বে। ফলে খোদ সিবিডির বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। আনক্লস যদিও সমুদ্র সম্পর্কিত, এরও অনেক ভাগ রয়েছে। সবগুলো জলবায়ু

পরিবর্তনের সঙ্গে মিলবে না। তবে হ্যাঁ, এসব কনভেনশন জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে ইন্টারলিংড। কিন্তু মনে রাখতে হবে যুক্তরাষ্ট্র যেমন কিয়োটো প্রটোকল মেনে নেয়নি, তেমনি সিবিডি অনুসমর্থনও করেনি। তারা যদি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে অন্যান্য কনভেনশনের বাস্তবায়নও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এজন্য জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে আলাদা আইনি কাঠামো এবং এর প্রতি সব পক্ষের অনুসমর্থন জরুরি। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়েই আলাদা আইনি অধিকার সমুন্নত রাখতে হবে।
এখন জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যু যে পর্যায়ে গেছে, তাতে করে আইনগত দিক থেকে উৎসাহব্যঞ্জক কিছু দেখা যাচ্ছে না। প্রত্যেক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দুই-তিন মিলিয়ন ডলার সহায়তা দেওয়ার কথা বলে বাংলাদেশের মতো দেশের সরকারের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রতিনিধিরা দেশে ফিরে সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়ে দেন যে এত ডলারের তহবিল গঠন করা হয়েছে। কিন্তু ওই তহবিলের আইনগত দিক নিয়ে কোনো কথা শোনা যায় না। সেখানে নরওয়ের মতো দেশ কত দেবে, আমেরিকার মতো দেশ কত দেবে, সে ব্যাপারে কোনো কথা শোনা যায় না। আমরা কে কত পাব, সেটাও নির্ধারিত থাকতে হবে। আমাদের মতো আরও অনেক দেশ ওই তহবিলের দিকে তাকিয়ে আছে। সেক্ষেত্রে তহবিল প্রাপ্তি ও বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণের মাপকাঠি কী হবে? ওই অর্থ কীভাবে ব্যবহার হবে, সে বিষয়েও সুস্পষ্ট বিধান থাকা উচিত। যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে বলে শোনা যাচ্ছে, সেটা দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা কতখানি সম্ভব? বিশ্বব্যাংক বা ইউএনডিপির হিসাবে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, সে তুলনায় এটা অনেক কম। অর্থ এলেই যে ভুক্তভোগীরা উপকৃত হবে তার নিশ্চয়তা কে দেবে? বাংলাদেশে ইতিমধ্যে গৃহীত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রকল্পগুলো নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।
আমি মনে করি, আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের সুরক্ষায় বিশেষ আইনি ব্যবস্থা থাকা দরকার। জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকতে হবে। সেটা দাতব্য নয়, অধিকারভিত্তিক হতে হবে।

শেখ রোকন : আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ খুব দীর্ঘ, আমরা জানি। তার আগ পর্যন্ত আমরা কী করব?
সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান : আমাদের উচিত হবে অভ্যন্তরীণভাবে সবাইকে নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অর্থ বা আইনি অধিকার না পেলে আমরা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকব? আমাদের জেলেরা কি বসে আছে? তাঁতিরা কি বসে আছে? আমাদের কৃষক কি আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তের জন্য বসে আছে? তাদের এখন উত্তরণের পথ দেখাতে হবে।
আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি নিজেদের সামর্থ্যে প্রস্তুতি নিতে হবে। আপনি দেখবেন, এখন ঢাকা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন নিয়ে বিস্তর কথাবার্তা হচ্ছে। কিন্তু আমরা কি উপকূলীয় অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণ

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে পেরেছি? জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার দিক থেকে কোনটি আমাদের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত?

শেখ রোকন : দেশে পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত কিছু আইন আছে। সেগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় কতটা আইনি সুরক্ষা দিতে পারে?
সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান : দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত একটি আইন হচ্ছে আমাদের দেশে। সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি আসবে। আর বিদ্যমান পরিবেশ আইন? এগুলো আংশিক সুরক্ষা দিতে পারে; কিন্তু তার আগে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। দেখুন, আইন থাকা সত্ত্বেও বছরের পর বছর পরিবেশ দূষণ চলছে। আমরা শিল্প দূষণের বিরুদ্ধে কথা বললে সরকার বলছে, শিল্পায়নের স্বার্থে ওই আইন ধীরে ধীরে প্রয়োগ করতে হবে। পরিবেশবাদীদের আখ্যা দেওয়া হয় উন্নয়নবিরোধী হিসেবে। আবার দেখুন আমাদের সেই সরকারই যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কার্বন নিঃসরণ কমাতে বলে, তখন তারা উত্তর দেয় উন্নয়নের স্বার্থেই কার্বন নিঃসরণ কমানো যাবে না। দেশের অভ্যন্তরে যে দোলাচল কাজ করে, সেটা আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমি মনে করি, পরিবেশবিরোধী উন্নয়ন কখনও প্রকৃত উন্নয়ন হতে পারে না। ইউরোপ ও আমেরিকার পরিবেশবিরোধী উন্নয়নের কারণেই কিন্তু গোটা পৃথিবী এখন জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির মুখে পড়েছে। ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর অস্তিত্বই বিপন্ন হতে যাচ্ছে।

শেখ রোকন : জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় কি আমাদের নতুন কোনো আইন প্রণয়ন করা জরুরি?
সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান : আমি মনে করি, জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির মুখে থাকা জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনি বাধ্যবাধকতার জন্য কি আমরা বসে থাকব? জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ব্যর্থ হলে আমাদের কী হবে, তা আগে থাকতে ভাবতে হবে।
আন্তর্জাতিক পর্যায়েও এখন মিটিগেশন, অ্যাডাপ্টেশন নিয়ে সফট আলোচনা চলছে। এই আলোচনাও রাইট-বেজড হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যাতে শক্ত অঙ্গীকার করতে বাধ্য হয়, সেজন্য আমাদের চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। কিন্তু সেটা অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি বাদ দিয়ে নয়।

16 †de“qvwi 2011